ভাঁটফুলসূত্র

সংখ্যা ০৩ | ফাল্গুন ১৪২৭ | ফেব্রুয়ারি ২০২১

ই-সাময়িকী, সংখ্যা ০৩
ফাল্গুন, ১৪২৭, ফেব্রুয়ারি, ২০২১

মূল কারিগর
আমান উল্লাহ, বদরুজ্জামান আলমগীর, হিরন্ময় চন্দ, মনিরা রহমান মিঠি, রফিক জিবরান, রুবাইয়াত রিক্তা, সাদাত সায়েম

শিল্পনির্দেশনা ও অঙ্গসজ্জা
হিরন্ময় চন্দ

প্রচ্ছদ
সৃষ্টির আদি অন্ত জীবন-মৃত্যু নিয়ে একটি প্যারাবল চিত্র

: ভাঁটফুলসূত্র

ভাঁটফুল
১১৯/২, উপশহর, রাজশাহী, বাংলাদেশ
ই-মেইল: bhatphul.pub@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bhatphul.com

ভাঁটফুলসূত্রের কোনো ধ্রুবতারা নেই, ধ্রুব সত্যও জানা নেই। অজানা পথে চলার আনন্দে ঘাটে ঘাটে পান খাওয়ার বাসনা পুষে রাখে যে মাঝি– ঝঞ্ঝা ও ঝড়ের কবলে বৈঠা বাওয়ার পথে সেটাই তার সঞ্জিবনী সুধা, অচিনপথের প্রেমের তরী বেয়ে কখনো যা ভেসে আসে ঢেউয়ের পরশে।

মানুষের অকৃত্রিম জীবনতৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার সৌন্দর্য– মিথ, কিংবদন্তী, লোকগাথাসমূহে– গুহাচিত্র, লোককথা, কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের শরীরে, ভাষায়, বয়ানে প্রস্ফুটিত। প্যারাবল সাহিত্যের এক প্রাচীন পরম্পরা। ভাঁটফুলসূত্র এই পরম্পরায় যুক্ত হয়ে পাঠকের সনে সখ্য গড়ে তুলতে চায়।

পথ অজানা, মন তবু অচেনারেই চায়!

সূচি

প্যারাবল

রফিক জিবরান

মধুপুর
নআমা হিচুই এর শিল্পদর্শন
দুটি প্রশ্ন
শ্যামলীমা
রামনি পঙ্খি
গন্তব্য

প্রবন্ধ

বদরুজ্জামান আলমগীর

আয়নার ভিতরে ময়না যে আছে

ভাষান্তরিত প্যারাবল

ফ্রানৎস কাফকা
ভাষান্তর: নিশাত শারমিন শান্তা

একটি রাজকীয় চিঠি

ভাষান্তর: নওশিন ইয়াসমিন

একটি প্রাচীর গড়ার সমাচার - একটি ভাঙন

ভাষান্তর: রুবাইয়াত রিক্তা

প্রহরী
মশীহ'র আগমন

ভাষান্তরিত প্যারাবল

হোর্হে লুইস বোর্হেস

ভাষান্তর: মাজহার জীবন

কিংবদন্তী
প্লট
সমস্যা

কবিতা

বেনজামিন রিয়াজী

সৎকার
প্রজাপতি
রূপান্তর
শিকার
আবারো একটি দিনের মৃত্যু হলো

লালন নূর

আনন্দ-রুমাল
উড়ন্ত বিমানের ছায়া
পরম আনন্দের অনল

রওশন রুবী

ক্রমশ দূরে যায় গৃহের ভুল
এপারে জল ওপারে অনল

কুমকুম বৈদ্য

যুদ্ধে যাব
মহামারীর দিন
নামহীন কবিতা

ভাষান্তরিত কবিতা

মওলানা জালালউদ্দীন রুমি
ভাষান্তর: জাভেদ হুসেন

লায়লার গলির কুকুর
মজনু'র শিরা কাটা
লায়লাকে খলিফার প্রশ্ন আর প্রশ্নের জবাব

গল্প

মনিরা রহমান
কন্যাতীর্থ

আবুল বাসার
অভিমান

রুখসানা কাজল
দুটি অণুগল্প

ভাষান্তরিত গল্প

সাদাত সায়েম

ভাষান্তর: ইশতিয়াক ফয়সল

প্রণয়

চিত্রকর্ম

আমান উল্লাহ
'মনোরা পাখি'

কাদের ভূঁইয়া
'পর্যায় জীবন-৪'

নিখিল চন্দ্র
'মাছধরা'

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
'বেহুলা'

শিল্পকর্ম : আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

প্যারাসল

রফিক জিবরান

মধুপুর

মধুপুরে সূর্য আসে ভোরে। পাখিদের গানে নির্জনে হিম ঝরে। পুরুষের চোখে দূরের আলোর শিখা, নারীদের বুকে লুকানো বীজের রশ্মি। এখানে পাখিরা মিহিমাঠের মোহনবাঁশি হয়– চোলাই রসের গন্ধে মাতাল চাঁদ আগুন জ্বালে পাতাদের শরীরে শরীরে।

এখানে সকলেই সকলের প্রতিবেশী। বুনোফুলের সাথে প্রজাপতি, প্রজাপতির সনে জোনাকি, জোনাকির পরশে শালগাছ, শালগাছের পাতার চিরলে সাত ভাই চম্পা– সকলেই সকলের। এখানে মানুষ কথা বলে হিয়ার সাথে, আত্মা চোখ বোঁজে দিগন্তের কোলে।

দূরাগত প্রজ্ঞা বলে- মধুপুরে সূর্য নামে মিহি মাঠে চাষীদের সঙ্গ সমীরণে-

মধুপুর পৃথিবীর হৃদপুর।

রফিক জিবরান

নআমা হিচুই এর শিল্পদর্শন

শামুকের খোলে পুষে রাখা আকাঙ্ক্ষার তসবিহ জপে নআমা হিচুই রং ও রেখার অজ্ঞাত
পথযাত্রায়।

বকুল ফুলের ছড়িয়ে পড়া সৌরভে চারুকলা তত্ত্বের কূটাভাস পেরিয়ে জলের সাথে মাটির সাথে প্রাণের সাথে রঙ ও রেখার ধ্যানমগ্নতায়, অনিশ্চয়তার অন্য এক আলো ও ছায়া, সম্পর্ক ও সংঘর্ষের দিগন্তে দাঁড়িয়ে চল্লিশ বসন্তের নআমা হিচুই। শহর থেকে দূরের আত্মভোলা কল্পনা বা নিবিষ্ট স্রষ্টার হৃদয়েই যার প্রকৃত ভাষান্তর সম্ভব।

রঙ, রেখা আর বউ শ্যামা তরঙ্গিনী– এই ত্রিভুজে নআমা হিচুইয়ের জীবন। শ্যামা যদিও তার আঁকার রেখায় মন স্থির করতে পারে না। হিচুই তবু শ্যামার মন ও শরীরে আদি পৃথিবী এবং অদেখা সকল মানবীর ইঙ্গিত ও আভাস টের পায়। জানে, চিরন্তন রূপ ও সৌন্দর্য তুলনার ক্ষীণ চোখের আলোয় দেখা যায় না। নআমা হিচুই ডুবে থাকে– ঝরে পড়া পাতা, ভোরের আলো, পদ্মার বিস্তীর্ণ আকাশের বিছানায় প্রজাপতি, ফড়িঙের ভেসে থাকায়। পেরিয়ে যেতে চায় বাস্তব পরাবাস্তবের দেয়াল– দালি, পিকাসো, মাতিসের রঙ ও রেখার বাঁধন পেরিয়ে দূরে জালালউদ্দীন রুমির গোলাপ বাগানে–। 'চিত্রকর্ম জাদুকর' সম্মাননার পরেও নআমা হিচুইয়ের মনে তাই নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার বোধ হয়।

হয়তোবা সে হতে চায়নি কিছুই কেবল পথ ও প্রান্তরে উঁকি দেয়া ছাড়া! 'আমি চাই সারল্যের আলো ও আধাঁর– চেনা নিশ্চিতির কারাগার যাকে বন্দী করে– ধ্যানের গোপন আরশিতে, বিস্ময়ে জাগে যে অচেনা, অলৌকিক আনন্দ ভার, বেদনার তরী বেয়ে বেয়ে কেবল যার দেখা মেলে'– নিজের সাথে আলাপে, পদ্মার পাড়ে বাবলার শরীর থেকে ঝরে পড়া হলুদ

রফিক জিবরান

নআমা হিচুই এর শিল্পদর্শন

বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকার মুহূর্তে হঠাৎ অদেখা এক প্রাণের ছবি দোলা দেয় তার মনে। হিচুই দৌড়ে বাড়িতে শ্যামা তরঙ্গিনীর কাছে আসে।

শ্যামার মনে নতুন প্রাণ স্পন্দনের ঘোর। মুখে সারল্য, আনন্দ আর বেদনার মিলিত ছায়া, চোখে পৃথিবীর প্রাচীন উজ্জ্বলতা–।

হিচুই শ্যামার হাত ধরে, সাত মাসের গর্ভে বেড়ে ওঠা প্রাণের পরে হাত বুলায়, শরীরে আঁকে রং ও রেখার আল্পনা– তৃষ্ণার্ত শিল্পীর মায়াবী বিহবলতায় সে শ্যামার পায়ের নোখ কেটে দিতে থাকে আর
অনুভব করে এক মৌল অসহায়তা– যার
উৎসারণে কাটিয়ে দিতে পারে সারাজীবন।
চল্লিশ বসন্তের অপূর্ণ বোধের অনুবন্ধে এক
মহামায়ার দেখা পায় নআমা হিচুই।

রফিক জিবরান

দুটি প্রশ্ন

১.
স্বর্গের দরজায় লম্বা লাইন। সকলকে জেরা করা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত দুটি প্রশ্নের মাধ্যমে। যারা ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারছেন তারা ছাড়পত্র নিয়ে আনন্দহাসি ছড়িয়ে স্বর্গে প্রবেশ করছেন গীতিবাদ্য সহযোগে। যারা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না তাদের উল্টোদিকের লাইনে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

চারপাশে উৎসবের আমেজ। ব্যাবিলনের সুমধুর বাঁশি, কাশ্মীরের লোকজ সুরের সাথে গঁগার সেই তাহিতি মেয়েদের নাচ, শকুন্তলার বিরহী চোখ, পারস্যের গোলাপ বাগান, একটার পর একটা স্বর্গীয় বিজ্ঞাপনে মনটা আনচান করে উঠছে।

পৃথিবীতে ঝর্ণাধারার যে রূপ সৌন্দর্য কল্পনা করেছি, সংগীতের যে ধ্বনিমাধুর্য চায়কোভস্কি, বাখ বা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন, তার চাইতেও অন্য এক আনন্দবিরহের সুর হৃদয় মনকে প্রজ্জ্বলিত করছে। বারবার ভুলে যাচ্ছি একটু পরেই আমার পরীক্ষা। দুটি প্রশ্ন!

২
সেমেটিকদের সাথে মিশরীয়দের চিন্তাপার্থক্য সৃষ্টির শুরু থেকেই। আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে মানুষকে, সেমেটিকদের এই সিদ্ধান্তের কারণে পৃথিবীতে সুখ নয়, দুঃখই পরম সত্য। সুখ কেবল স্বর্গে পাওয়া যাবে যদি যথাযথভাবে তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা হয়, জীবনভর ক্ষমাভিক্ষা ও চূড়ান্ত নতজানু না হলে যা মিলবে না।

মিশরীয়রা অন্য বিধানে চলে। দুঃখকে দূরে সরিয়ে যারা আনন্দে বিহার করে, অপরের জন্য আনন্দ সৃষ্টি করে, স্বর্গে অধিকার কেবল তাদের। আমার আদিমাতা নীল নদের তীরে বসত গড়েছিলেন বলে শ্রুতি আছে। যদিও এ বিষয়ে যথাযথ প্রমাণ নেই, তথাপি সেমেটিকদের সাথে সখ্য–ই বেশি। মনে তবু আশার নিভুনিভু সলতে। সেই নিভুনিভু সলতে নিয়েই আমি মিশরীয়দের স্বর্গের লাইনে দাঁড়িয়েছি।

৩
সামনের লাইনটা ছোট হয়ে আসছে। দুজন ফারাওকে গেট থেকে বিষন্ন মনে উল্টো দিকে যেতে দেখলাম। ফারাওরা দলবল নিয়ে চলাফেরা করে এখন সাথে সঙ্গী কেউ নেই।

পিরামিডের শিল্পীরা হৈচৈ করতে করতে স্বর্গের টিকিট নিয়ে ভেতরে চলে গেল। বাংলার ভাটিয়াল গায়কের দল, হরপ্পার মৃৎশিল্পী, আদি আমেরিকার ভূমিসন্তানদের চোখে খুশির বিদ্যুৎ ।

তুমি কি পৃথিবীতে আনন্দে ছিলে? প্রথম প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর জানা নাই। কিছু মুহূর্ত ছিল আনন্দের। সেই সব মুহূর্তের স্মৃতি ক্রমে হারিয়ে ফেলি, আবার কিছু মুহূর্ত আসে। স্বর্গের গেটে হ্যাঁ ও না-এর মাঝখানে কোন উত্তর হবে না! হয় হ্যাঁ নয়তো না। আমি কি বলবো?

৪
এখানে কোনো নরক নেই, কেবল অন্তর্গত আনন্দ উপলব্ধির সংশোধনাগার ছাড়া। মিশরীয়রা নরকের ভয় দেখায় না, বরং সংশোধনের সুযোগ দেয়!

আমার সামনের লাইনে দাঁড়ানো মানুষটি বরফদেশের, তার চোখে প্রাচীন প্রজ্ঞা। বললাম, ভয় ছাড়া শাসন হয় কীভাবে?

সে বোধহয় জানতো আমি এ রকম কিছু বলবো। সৃষ্টির আদি প্রেরণা আনন্দ, সে দূরে তাকিয়ে নরম করে জানাল, স্রষ্টার আনন্দ সৃষ্টির শরীরে ব্যক্ত হয়।

৫
তুমি কি অন্যের জীবনে আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছ? স্বর্গের গেটের দ্বিতীয় প্রশ্নটা প্রথম প্রশ্নের চেয়ে সহজ।

শুধু উপভোগের কথা ভেবেছি, নিজের আনন্দ নিয়েই মগ্ন ছিলাম সারাক্ষণ! ভাবতে ভাবতে একটা বুনোফুলের গন্ধ ভেসে এলো আবছাভাবে।

গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। জানা প্রশ্নের উত্তর নেই আমার কাছে।

রফিক জিবরান

শ্যামলিমা

নিজেকে হারিয়ে ফেলার পথে ঘুরে দাড়াঁনোর মরিয়া চেষ্টায় শ্যামলিমা একদিন মতিহারে যায় বাবলা বনের কাছে, সঙ্গে নেয় বিয়াল্লিশ বছরের শরীর ও মন।

কত বিচিত্র উপায়ে আগ্রাসন চলে প্রতিদিন! শরীর ও মন দখলের প্রকাশ্য, পরোক্ষ, গোপন ও গেরিলা আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে কে যে কখন কোন ক্ষমতার দাস হয়ে যাই– পুঁজির দালাল, রাষ্ট্র বা কর্পোরেট, পার্টি বা আদর্শ, কথিত কমিউনিস্ট বা এনার্কিস্ট, নাস্তিক বা ধার্মিক, পরগাছা বা এনজিও, টের পাও? পুতুল বানাতে চাও, লাথি মারো, ফুটবল খেলো। হয় ভোগ নয়তো ভোগ্য– এই তো খেলা!

শরীরকে পণ্য বিক্রির মন্দির বানাতে চেয়ে একদল গায়ের কাপড় ছোট করতে করতে প্রায় নাই করে ফেলে আর আরেক দল কাপড়ের ভেতর কারাগার বানাতে চায়। এইসব খেলায় তুমি কোন দলে?

বাবলার হলুদ ফুল, কিছু বলো?

কে কাকে ব্যাখ্যা করে, জীবন দেয় বা হত্যা করে?
বাবলা বনের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যামলিমা– তাকিয়ে আছে বিয়াল্লিশ বছরের দিকে। মানুষের সাথে, প্রকৃতির পরশে, একক ও বহুত্বের সার্বভৌম সম্পর্ক, প্রেম, লড়াই– জীবন–

রফিক জিবরান

রামনি পঙ্খি

আত্মায় ফাঁস নিয়ে সবাই পরদেশী ভাব, ভাষ্য বা ভগবনের কাছে মাথা নোয়ালে রামনি পঙ্খি একা হয়ে যায়। একা হয়ে গেলে সে কাব্য চর্চা শুরু করে।

নিন্দুকেরা বলে রামনির অনেক নাঙ। অবশ্য পঙ্খিদের নাঙ বেশি থাকাই স্বাভাবিক। এসব কথায় সে নির্বিকার থাকে অথবা প্রাচীন শ্লোক আওড়ায় যার অর্থ কেবল একজন বিশেষ নাঙ বুঝতে পারতো, যদিও সেই নাঙ এখন নিরুদ্দেশ বা পলাতক বা অপঘাতে মৃত। তবে রামনি পঙ্খি স্বজাতির ভাবের মাজারে ডুব দিতে দিতে নিজের পরিচয়কেও ক্রমাগত রুপান্তর করতে থাকে বা অন্য সকলের কাছে তার পরিচয় বদলাতে থাকে।

একদা নির্জন ঘুমে রামনির মনে এক সাধিকা হানা দেয় এবং সেই সাধিকা নিজেকে স্মরা বলে দাবী করে। স্মরা শব্দটা সেই নারীর কাছে প্রথম শোনে। শব্দটার অর্থ সে বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু শব্দটা যেন নিজেকে আড়াল করতে চায়। রামনি সিদ্ধান্ত নেয় শব্দটার অর্থ তাকে জানতেই হবে– তার মনে হতে থাকে শব্দটা হয়তো প্রাচীন আত্মাদের রেখে যাওয়া কোনো ইশারা বা সূত্র, যার ধ্যানে স্বজাতির ঐকতানকে সে খুঁজে পাবে।

রামনি পঙ্খি স্বজাতি ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে হাজির হয়ে অতীত স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চায়, যেমন খরার সময় খোদা বা ভগবানের কাছে প্রার্থনা বা এরকম কিছু তাদের মনে পড়ে কিনা, ইত্যাদি। প্রতিমাসে সে একটা করে গ্রামে হাজির হয়। শিশুদের সাথে ঐরাবত খেলায় অংশ নেয়, কখনোবা নিজেই সাজে ঐরাবত। শিশুদের মায়েরা এতে রামনির ওপর প্রসন্ন হয়ে উঠানে বসতে দেয়। সে ক্রমে এভাবে বাড়ির বৃদ্ধদের সাথেও আলাপের সুযোগ পায়।

রামনি লক্ষ করে স্মরা শব্দটা তাদের জানা। কিন্তু এর অর্থ তারা জানে না। গল্প ও লোককথা বলার সময় সকলের চোখে দীপ্তি লক্ষ করে। প্রাচীন গল্প ও রূপকথা বা বিশ্বাস মানুষ তারা পুরো ভোলেনি। নয়মাসে নয়টা গ্রাম ঘুরে বেড়িয়ে, গল্প শুনে শুনে স্মরা শব্দটার সম্পর্কে একটা আবছা অর্থ উদ্ধার করে।

মানুষ স্মরণে রাখে প্রেম। সেই আদি প্রেম যা মানুষকে আগুন জ্বালাতে সাহায্য করেছিল। আগুন– সেই আদি প্রেমের অনন্য সৃষ্টি! ক্রমে রামনি পঙ্খির নাঙের সংখ্যা বাড়তে থাকে কেননা এখন প্রতিটি গ্রামেই তার নাঙ বা অনুরাগী আছে।

সাধিকা আবার দেখা দেয় রামনির স্বপ্নে। স্মরার বাক্যসুরায় সে আবিষ্ট হয়। রামনি হয়তো এমন আবিষ্টতার অপেক্ষায় ছিল। সে চেয়েছে এমন জীবন ও প্রকৃতি যা তাকে ঘোরলাগা ধাঁধায় ফেলবে। রামনি স্মরা শব্দের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করার লক্ষ্যে পঙ্খিজাতিভুক্ত সকলের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সঙ্কল্প করে। সে কবিতা লেখে–

আমার নাম রামনি পঙ্খি
পঙ্খী জাতির ভাব-কুটুম্বী।

রফিক জিবরান

গন্তব্য

প্রাচীন দেয়াল থেকে খসে পড়া মানুষের স্মৃতি আর এই কাল্পনিক বর্তমানের টুকরো টুকরো ক্ষণিক মূহূর্তগুলো এক চরম অর্থহীনতায় দোল খেতে খেতে, ধূলিকণা থেকে দূর্বাঘাসের শেকড়ে, প্রাণ থেকে জড়, জড় থেকে প্রাণের লীলাময়তায় ভেসে বেড়ায়।

অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবিন্দুতে অদৃশ্য এক বর্তমান ক্রমাগত দূরে সরে যায়, সময়ের নৈরাজ্যের ভেতর এক মায়া, এক সুদূর পারের ঘাট– মানুষের সুন্দরতম সৃষ্টির ভেতর ঘুরে বেড়ায়।

কোথাও যাওয়া হয় না কখনো, কেবল স্থানান্তর ছাড়া। শেকড় ছিঁড়ে ভিন দেশে গিয়ে শেকড়ের স্মৃতির ভেতর, ফেলে যাওয়া পুকুর ঘাটে সজনে গাছের সাথে অপেক্ষায় থাকা ছাড়া।

সব স্টেশন মাস্টারই জানে, যাত্রা এক নিরন্তর কল্পনা, মায়া। কেউ বর্তমান ছেড়ে যেতে চায় অচিনপুরের প্রেমে, দূরের নাবিক আসে বর্তমানের অচেনা স্টেশনে।

হুইসেলের শব্দ, কুলিদের ছোটাছুটি, শিশুর চোখের আলোয় মায়ের মুখের ছটা– কেউবা কাছে পায় বন্ধু, উড়ে চলা সময়ের নৈকট্য, কখনো কথা-না-বলা মানুষের মুখ– স্টেশনে এলে মনে হয় কোথাও হয়তো একটা গন্তব্য আছে।

‘মনোরা পাখি’
আমান উল্লাহ
মাধ্যম: কাগজে এক্রিলিক

আয়নার ভিতরে ময়না যে আছে

বদরুজ্জামান আলমগীর

এমন কথা আছে যা আমরা ঠারেঠুরে বলি, আবার সে-রকমও বুলি থাকে যা ইচ্ছায় আসে, কিন্তু ভরসায় ঠিক কুলিয়ে ওঠে না, ভরসা পাওয়া যায় যদিওবা, সাহসে ঠিক বেড় দেয়া যায় না– ফলে সবার সামনে জোরে বলতে গিয়ে অনেক সময় আর্তনাদে ফেটেফেটে যায়, অথবা নিজের কথাটা অসহায় প্রতিধ্বনি হয়ে নিজেরই চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে।

ওই যেমন কাজাখ লোককথার নাপিতের দশা হয় কখনও কখনও। নাপিত রাজদরবারে যায় রাজার চুল কাটতে। পরম যত্নে, নির্বাচিত আতঙ্কে নরসুন্দর বাদশাহ নামদারের মাথায় চিরুনি প্রক্ষালন করে। নাপিতের অনুভব হয়–কোথাও চিরুনি বুঝি খানিকটা হোঁচট খায়। নাপিত তাই রাজার মাথা বরাবর আমল করে চায়– নাপিতের চক্ষু চড়কগাছ!

রাজা মশাই হস্ত ইশারায় নাইপতার বেটাকে থামায়–
আমি জানি আমার চিকুরের আড়ালে কী দৃষ্টিগোচর হয়। শোন। জি, বলুন বাদশাহ নামদার। যা দেখেছো, দেখেছো। এই কথা অন্য কারো কাছে ঘুনাক্ষরেও বলেছো তো এক নিমেষে গর্দান যাবে।

কোনরকম জান নিয়ে লৌহ ফটক পেরিয়ে নাপিত নিজের বাড়ি আসে বটে, কিন্তু সে নতুন দিকদারিতে পড়ে। কথা নাই বার্তা নাই নাপিতের পেটের ভিতর একখান কথা খালি ঘুরপাক খায়– বেরুতে ছটফট করে, আর কথাটি খালাস হতে না পেরে পেট ফুলে ঢোল হতে থাকে।

ভয় পেয়ে, নিরুপায় নাপিত পেট ফোলার ত্রাসে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। জঙ্গলের ভিতর ছোটার সময় নাপিত দেখে গাছবিরিখের আড়ালে এক নিরালা ইদাঁরা– তার ভিতর স্বচ্ছ পানি আয়াস বেঁধে থাকে। নাপিত কুয়ার ভিতর মুখ বাড়িয়ে লম্বা করে চায়– ইঁদারার ভিতর আরেক মনুষ্য রূপ– তাহা দেখতে পায়।

নাপিত এবার মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস পানির তলে মানুষটিকে বলে– রাজার মাথায় শিং আছে, রাজার মাথায় গরুর শিং! এই মোক্ষম কথাটি বলার সঙ্গেসঙ্গে নাপিতের পেট মিইয়ে আবার স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে।

নাপিতের পেট চুপসে আগের জায়গায় গেলে আপাতত তার সমস্যার সমাধান হয় সত্যি, কিন্তু উত্তর নিশ্চয়ই পায়নি– একটি উত্তর তাকে আরো অনেক অনুত্তরের ঘোরের

মধ্যে ফেলে। উত্তর বরাবর পুকুরের মত– কেটে ছোট করতে চাইলে আরো বড় হয়।

নাপিত থেকে এবার একজন ধোপার শত্রুমিত্র, চালচিত্র, দেনদরবার ঘুরে দেখে আসি:

এক দীনহীন ধোপা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ময়লা কাপড় জড়ো করে। কাপড়ের গাটরি সে ঘোড়ার পিঠে তুলে নদী ঘাটলার দিকে যায়, নদীর ঘাটে কাপড় কেচে নদীর পাড়েই শুকাতে দেয়; শুকানো কাপড় ঘোড়ার পিঠে আবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে– তার বদৌলতে ধোপা ধানের মরশুমে টোকরি ভরে চুক্তির ধান তোলে।

কিন্তু আজ নদীর ঘাটে এসে ধোপা একটা বড় ধরনের মুসিবতে পড়ে। ঘোটকের পিঠের কাপড় খালাশ করে যেই না ঘোড়াকে গাছের সঙ্গে বাঁধতে যাবে– তখনই বুঝতে পারে, ধোপা বেচারি ঘোড়া বাঁধবার দড়ি আনতে ভুলে গেছে।

এদিকে বেলাও ঢালুতে গড়িয়ে যায়; ঘোড়া না বেঁধে কোনভাবেই জলে নামতে পারবে না ধোপা। তাই ধোপার মাথার চুল ছেঁড়ার দশা। এমতাবস্থায় নদীর পাড় ঘেঁষে হাটে যায় গ্রাম পঞ্চায়েতের এক মুরুব্বি। মুরুব্বিকে ধোপা পুরো বিপত্তির কথা খুলে বলে এবং এর সুরাহাকল্পে পরামর্শ চায়।

বর্ষীয়ান পঞ্চায়েতী বলেন– এটা বড়ই নেহায়েত সমস্যা: তুমি ঘোড়ার কাছে যাও, অন্যান্য দিন যেভাবে ঘোড়াকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখো– ঠিক একইভাবে দড়ি বাঁধার অভিনয় করো– নিশ্চিত করো– ঘোড়া যেন দেখে তুমি তাকে বেঁধে রাখছো। আমি জানি, তুমি দড়ি আনোনি–ভুলে গ্যাছো; কিন্তু ঘোড়াকে বোঝাও তুমি প্রতিদিনের মতোই দড়িতে ওকে বেঁধে রাখছো। মুরুব্বি যা বলেন, লক্ষ্মী ছেলে ধোপাও তা-ই করে; তাতে ষোল আনা কাজ হয়।

কাপড় শুকিয়ে ঘোড়ার পিঠ বোঝাই করে খুশি ডগমগ ধোপা ঘোড়া হাঁকায়– হাঁট ঘোড়া, ঘরকে চল! কার কী-বা আসে যায়– ঘোড়া নড়ে না। ধোপা আবার বলে, চিৎকার করে– ঘোড়া নেহি শুনতা হে।

ধোপা পড়িমরি বুড়োর কাছে আর্জি পেশ করে যে, ঘোড়া পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, এক পা নড়ে না। পঞ্চায়েত জন আবার বলে– এর সমাধান একেবারে জলভাত: তুমি দড়ি খোলার অভিনয় করো, কেবল খেয়াল রেখো ঘোড়া যেন দেখতে পায়।

ধোপা ফিরে এসে নিখুঁতভাবে ঘোড়ার চোখের সামনে দড়ির গিঁট খোলে, আর বলে– হাঁট, হাঁট ঘোটক– বেলা যে গড়ায়, গাঁয়ে চল। ঘোড়া এবার ঠিকঠিক হাঁটতে শুরু করে।

যা আছে, তা ছিল, যা থাকবে– আগে ও পরে।

বেদান্ত প্যারাবল: দড়ি নাই দড়ি।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি–দৃশ্যময়তায় দৃশ্যহীনতা বিনির্মিত হতে পারে, আবার দৃশ্যহীনতাও দিব্যি গড়ে তুলতে পারে এক দৃশ্যময়তার জগত।

নিচের লেখাটি একচক্কর ঘুরে আসি:

তামাম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঘটনা ঈশ্বরের মানুষ আবিষ্কার, অথবা অন্যভাবে, মানুষের ঈশ্বর উদঘাটন। এই পুরো ঘটনাটি ঘটে অদৃশ্যকে দৃশ্যমানে বাঙময় করে তোলার প্রক্রিয়ার ভিতর।

আমরা সবাই ইচ্ছায় কী অনিচ্ছায় প্রকৃতির উৎসের সঙ্গে একটি ছন্দে বাঁধা। প্রতিটি জীবন এই উৎসের নাভিমূল থেকে আসে – আবার মূল বিন্দুর দিকে গমন করে। আমরা যেমন দৃশ্যমান জৈবিক মা-বাবাকে কাছে চাই, একইভাবে অদৃশ্য কেন্দ্রীয় জনক-জননীকেও অন্বেষা করি; এই খোঁজাখুঁজির এক নিশি পাওয়া সমাপ্তির নাম ঈশ্বর।

এক চক্ষুস্মানের সঙ্গে আরেক দর্শকের দেখা হলে সব উপরিদৃশ্যের ছবি মেলে– যে দেখা অর্ধেক। উপরটুকু দেখা যায়, ভিতর থেকে যায় আড়ালে।

দু 'জন অন্ধের দেখা হলেই কেবল ভিতর-বাহির স্বপ্ন ও জাগরণে, বাস্তব ও অধিবাস্তবের স্থিরতা আর চাঞ্চল্য একযোগে আলোকান্ধকারে বিকশিত হয়ে ওঠে।

একজন অন্ধ বুদ্ধের সঙ্গে আরেকজন অন্ধ বুদ্ধের দেখা হলে জগতের সবকিছু দেখা যায়!

বদরুজ্জামান আলমগীর: অদেখাকে দেখা। হৃদপেয়ারার সুবাস; প্রকাশক ঘোড়াউত্রা প্রকাশন।

অন্ধতা বাঙময় হয়ে ওঠার মুন্সিয়ানা নানা কোণে, বিবিধ নিমগ্নতায় কল্পনার দিগন্তে জেগে উঠতে দেখি:

জ্যোতির্বিদ।। একদিন আমি ও আমার বন্ধু এক মন্দিরের ছায়া ঘুপচির ভিতর একজন অন্ধ লোককে দেখতে পাই। আমার বন্ধুটি বলে ওঠে– এই যে, দেশের সবচেয়ে বড় বুজুর্গ মানুষটিকে দেখো।

একসময় আমি আমার দোস্তকে রেখে অন্ধজনের কাছে সালাম দিয়ে দাঁড়াই, কথাবার্তা বলি। জিজ্ঞেস করি, যদি কিছু মনে না করেন, আমাকে বলুন– কতোদিন ধরে আপনি চক্ষুহারা? এভাবেই জন্মেছি আমি।

আপনার সাধনার মার্গ কী?

আমি একজন জ্যোতির্বিদ। বলেই তিনি নম্রতায় হাতজোড়া বুকের উপর রাখেন– এখানে দুনিয়ার তাবৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র সব দেখতে পাই। কোহলিল জিবরান : জ্যোতির্বিদ।

অন্ধতা যেমন, প্রাণের ক্ষরণও নিমজ্জমান প্রজ্ঞায় বোধের নতুন খিড়কি খুলে দিতে পারে:

রুমি বলেন–তুমি আমার মন ভেঙে দিয়েছো– আমি সে হৃদয় আর রিফু করি না– আমার ভাঙা হিয়া-পাঠই তোমার আমাতে প্রবেশের দরোজা– আমার মনমনুরা আঘাতে ফাটা না হলে তুমি সেখানে ঢুকবে কীভাবে?

রবীন্দ্রনাথের অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি, ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি! সকালবেলা চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি কি, ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে– একই মর্সিয়া।

মানুষ নিসর্গের অয়োময়ে কুমারপোকার অন্ধতায় লকড ডাউন হয়ে আছে– যেখান থেকে বেরুবার আর কোন ফোকর নেই, দরোজা লোপাট; অথবা বাজার বিজ্ঞাপনের উঁচু ও শক্ত বিলবোর্ডের বাইরে লকড আউট হয়ে মাথাকুটে মরে!

চরের নিদয়া হাওয়ার নিচে ফেটে থাকে যে বাঙ্গি তার থেকে মনফকিরি আর কী-ইবা হতে পারে! পুড়ে ছিদ্র হয়েছে বলেই তো বাঁশির সুরে আমাদের মনে এমন জোয়ারভাটা ও চন্দ্রকানা লাগে।

কালের চন্দ্রালোক পরাগে অহর্নিশি জেগে কোন মেস্তরি বানায় উজানভাটির পাতাম নাওখানি রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে, গাবকালি মাখায় জালালউদ্দিন রুমির ফাটা ফাটা ধ্যানে, লালন সাঁইজির জবাফুলে, রাধার নসিবে।

বদরুজ্জামান আলমগীর : ভাঙা হিয়া পাঠ।

এই যে হৃদয়ের হারলেমে দেখাদেখি তার কোন লেখাজোখা নেই, আকার আকৃতি, দাগ খতিয়ান নেই- কী অতীত কী বর্তমান ভবিষ্যৎ আর অনাগত কাল তমসার প্রিজমে মুখ বাড়িয়ে ধরে। তারই একটি নমুনা নিচের প্যারাবল:

আনন্দধারা বহিছে।। নানা জনকে নানা কাজে আনন্দ পেতে দেখি– কেউ উঁচু ব্রিজ থেকে বর্ষার জলে লাফিয়ে পড়ে আনন্দ পায়, কেউবা চাকু দিয়ে নিজের হাত ফালাফালা করে কেটে জিভ বের করে লিকলিক করে হাসে, কারো আনন্দ দৈহিক মিলনে, কেউ নিরানন্দের কাঠিন্যকে উৎসব ভাবে, কেউ ছুটন্ত তীরের সামনে বুক চিতিয়ে হর্ষে লাফায়, কারুরবা উল্লাস অন্যকে ঠেঙিয়ে! অবশ্য সিংহভাগ মানুষেরই আনন্দ অন্যকে হারিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার উচ্ছ্বাসে।

আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হই ঠিকানা হারিয়ে ফেলে – কোথায় যাবার কথা ছিল যখন তার দিশা পাই না!

আমি কোনভাবেই মোকাম করে উঠতে পারি না পূর্বজন্মের স্মৃতি আর আগামী জন্মের পিছুটানের মাঝখানে একটি লোকগীতির সুরের মধ্যে কে তুমি ফুটে থাকো এমন পদ্মফুল – লোটাস, লোটাস!

বদরুজ্জামান আলমগীর : আনন্দধারা বহিছে, হৃদপেয়ারার সুবাস।

ফরিদা । আনোয়ারউদ্দিনের দিন গ্যাছে পথের মোড়ে, ট্রেনের চাকায়, তার কাঙ্ক্ষিত নীড়ে কোনদিন সময়মতো ফেরা হয়নি। তকদিরের খোঁজে অজপাঁড়াগ্রাম থেকে আনোয়ারউদ্দিন যায় থানা শহরে– ব্যবসাপাতি করার উদ্যোগ করে, পরে যায় আরো বৃহত্তর শহরে, শহর থেকে নগরে, আয় রোজগার করে, বাচ্চাদের পড়াশোনা করায়, সংসারের খরচপত্র জোগান দেয়।

এভাবেই বেলা গেল সন্ধ্যা হলো–ভূতের কাঁধে চড়ে কোনদিক দিয়ে বুঝি জীবনের বেবাক সময় জেব্রা ক্রসিঙেই শেষ হয়ে যায়!

বর্ষার স্রোতধারা বিলের বুকে তীব্র তোড়ে বয়ে যায়– ফলে ঝরা পাতা, বালুকারাশি, শামুক ঝিনুক ঢালুতে সরে আরো গভীর নদীতলের দিকে হারায়। কিন্তু বাউয়া ধানের লম্বা চারা পানির আঘাত সয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, ভেঙেচুরে যায়, তবুও দাঁড়িয়ে থাকে।

আনোয়ারউদ্দিনের বুকের গহীনে কাঁচা রঙিন টিনের বাক্সে বাউয়া ধানের চারার মতোই একটি কায়া– ফরিদা, অতিদূর ফেলে আসা নাম জীবনের জঙ্গমতা ও রুক্ষতার মুখেও নির্নিমেষ মাথা নুয়ে থাকে। আনোয়ারউদ্দিন হয়তো সম্পূর্ণভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও না– কিন্তু অনুভবে, অজ্ঞানে তার মধ্যে সতত জেগে রয়।

৭৩ বছরের দীর্ঘ জীবন শেষে আনোয়ারউদ্দিনের অন্তিম ক্ষণ এসে হাজির। তার আত্মীয়রা চারপাশে ভিড় করে থাকে– তাহারা যুগ যুগান্তরে পাওয়া পবিত্র গ্রন্থের দরদী কালাম পড়ে। কিন্তু দুনিয়ায় আর আনোয়ারউদ্দিনের বাতাসের হিস্যা নাই।

মৌলভি গামছার এক মাথা ধরে তাকে তওবা পড়ায়, আর কানের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করে: তোমার অন্তিম বাসনার কথা বলো। এই কথার সুইসুতায় কোন গহীন থেকে বুঝি আনোয়ারউদ্দিন বলে– এক চামুচ পানি খাবো। কার হাতে পানি খাবে বলো?

পৃথিবীর আদিমতম সৃষ্টিদিনের সরল, অনিঃশেষ থেকে একটি নাম বলে আনোয়ারউদ্দিন– ফরিদা। ফরিদার হাতে একচামুচ পানি খাবো।

ক্লাস এইটে পড়া ফরিদার কথা কেউ কোনদিন তার মুখে শোনেনি, কিন্তু তার আনন্দ বেদনার বিমূর্ততায় ৭৩ বছরের গাবকালি মাঝে, আড়ালে অন্তরালের ভাঙাচোরায় তার সঙ্গেই যে ছিল।

এক জীবনের অলিগলিতে, পাক কালামে, জলসাঘরে, অনাহারে, দখিনা হাওয়ায়, বাসনার প্রাণপণে যাহারে চায়, খোয়ারির নিগূঢ়ে ফরিদা নামটি ছিল।

এভাবে দিনান্তের কূলে এসে ভিড়ে ফরিদা– আনোয়ারউদ্দিনের আয়না ও তার উপর বসা একটি মর্মের চড়ুই পাখি– ঠোঁটে তার লৌ আর জবাফুলের মনতারা, ইবাদত!

বদরুজ্জামান আলমগীর : ফরিদা।

ফরিদা ছাপা হলে পাঠকের প্রতিক্রিয়া আসে আশ্চর্যজনক। এখানে প্রোটাগনিস্ট আনোয়ারউদ্দিন– তার চৈতন্যের গভীর গহন বারামখানায় কীভাবে ফরিদার স্মৃতি প্রতিমা ধারণ করে রাখে আনোয়ারউদ্দিন এবং জীবনের শেষক্ষণে কীভাবে সবাইকে অবাক করে ফরিদার কথা বলে আনোয়ারউদ্দিন তা আমাদের হৃদমাঝারে ঘনঘোর হয়ে নামে। কিন্তু পাঠকের মনে আসন পেতে বসে আনোয়ারউদ্দিন নয়– ফরিদা।

কিছুটা অন্যমাত্রায় একজন পাঠকের সঙ্গে ইটালো কালভিনো জড়িয়ে পড়েন এক অদৃশ্য খেলা ও জেরায়।

প্রক্রিয়াটা কিন্তু তা-ই আসলে। পাঠ একটি ব্রতযাত্রার সামিল– পাঠকের মনেও অনেক মানত থাকে, সেই আশাগুলি পাঠক বইয়ের ভিতর রুয়ে দেন; নাটক বা সিনেমার দর্শকের বেলায়ও হয়তো একই প্রক্রিয়া কাজ করে। তাই অনেকসময় চলচ্চিত্রকার ও তার দর্শক, থিয়েটার এবং তার অডিয়েন্স খুব ভিন্নতর বোঝের উপর দাঁড়ান। আবার অনেকে পাঠক লেখক, চলচ্চিত্রকার, নাট্যকার এবং দর্শক একই পাটাতনে এসে দাঁড়াক তা চান না, হয়তো কিছুটা মানহানিকরও মনে করেন।

এ-বেলায় উডি অ্যালেনের একটি কথা মনে পড়ে; অ্যালেন বলছিলেন, তাঁর কোন সিনেমা দর্শকনন্দিত হলে, দর্শক সিনেমাটিকে একদম নিজের জীবনসত্য মনে করলে তাঁর মনে হয়– এমন তো হবার কথা নয়, কোথাও একটি ভুল হচ্ছে, বা গোটা ছবিটিই হয়তো ঠিকমতো বানানো হয়নি।

ইটালো কালভিনো খুবই ভিন্নতর একটি মনস্তত্ত্বে ইফ অন এ উইন্টার'স নাইট এ ট্রাভেলার বইটি লেখেন। এখানে মজার একটি পাজল আছে– বইটি পড়তে শুরু করলে এর কোন আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি নাই–প্রথার শৃঙ্খলাও নাই; তার কারণ, এখানে লেখক পাঠকের জন্য বইটি লেখেননি, বরং উলটো পাঠক লেখকের জন্য বই লিখছেন।

এ এক নোতুন ধরনের পাঠাভিযাত্রা। প্রতিটি ভাগে, পরিচ্ছেদে পাঠক নিজেই নিজের মন জোগায়, এ বুঝি এক অসাধ্য সাধনের চেষ্টা। তরুণ মুসুল্লি– নামাজে দাঁড়ালে তার মন যেমন মুহূর্তে দুনিয়া ঘুরে দেখার জন্য ইবনে বতুতা হয়ে ওঠে, পাঠকের মনও সেভাবে নানা বনে উপবনে, কখনো লাইব্রেরির তাকে উঁকিঝুঁকি মারে, আবার হয়তো তার দরজা গলিয়ে বেরিয়ে যায়। এখানে পাঠক লেখকের প্রকল্পের সঙ্গে মিলাচ্ছেন না, লেখক পাঠকের অলিগলিতে নিজেকে বসানোর চেষ্টা করছেন।

ইতিহাসে এমন ঘটে– আমরা অতীতের ঘোড়ায় চড়ে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করি, কখনও বা ভবিষ্যতের বাঞ্ছায় অতীতের ঘর গুছিয়ে তুলি। অথবা এমনও হয়, হতে তো পারে– জন্মমৃত্যু, পূর্বপশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ আলাদা বলে কিছু নেই, আমরা কাজের সুবিধার জন্য তালিকা বানিয়েছি মাত্র।

আনার দানা।। তামাম দুনিয়া বুঝি একটা আনার ফল, হঠাৎ ফেটে গিয়ে আকাশ ভরে ফুটে উঠেছে তারা– আনার ফলের দানা।

এতো তারার ঝিলমিল নীরবতার নিচে, নক্ষত্রখচিত কোটি শিশুর মহল্লায় ঘোর লাগে– নিজের বুকের ভিতর সাত তবক আসমানের শিবনাথ ইশকুলে কখন যে অনূদিত হয় সরিষাপুর গ্রাম, ঢাকা শাহবাগ উপন্যাসের মোড়, আর ফিলাডেলফিয়া লিবার্টি বেল অঞ্চলে তুমুল জেনট্রিফিকেশনের উন্নয়ন উচ্ছেদ।

এতো হৈ-হুল্লোড়, ঝকমারির ভিতর আমার ভুবনপুরে এসে ছাউনির ঘর তোলে আমার নানু - সূর্যের মা- একাত্তরের যুদ্ধ থেকে যার ছেলে আর কোনদিন ফিরে আসেনি; কৌরালের সঙ্গে তার রাত্রিদিন জেগে থাকা সংসার- ঘুম নাই, জমজমের পানি নাই : জীবন বুঝি পলিথিনের ব্যাগ– কান্নায় গলে না, অপমানে টলে না।

নির্ঘুম নানুকে দেখি– কী অপার মমতায় জায়নামাজের পাটি ভাঁজ করে রাখে; মনে হয়– যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া তার ছেলে মিজু বুঝি জায়নামাজের ভাঁজে ভাঁজে মিশে আছে!

নানু কী আমার উপর এসে ভর করে? না হয় আমিও কেন পালা কেটে কেটে জমা রাখি লাটিমের ঘুন্নি, উষ্ণা বাড়ির পিছনে খালের করচনা ঢালুতে পড়ে থাকা ভূতলবাসী হামিদের বুকে জমাট রক্তজবা, সেই খালের ঢালুর উপরেই হঠাৎ দুইবেণী কিশোরী এক আমার ইনসমনিয়ার ভাঁজে ভাঁজে আজও ফুটে থাকে!

এতোদিন পর আমি হই আম্বিয়া খালা– ভাসতে থাকি আশার জাজিমে; আমারও চারপাশে স্তূপ হয়ে জমে ওঠে ইসিমের দানা– রইন্না গুডা, বুড়ি দাদী আয়নার মা'র এক প্যাঁইচ্চা শাড়ি– মৌলাধুনিক এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম; ও আমার অন্তর কানা, আকাশভরা সূর্য-তারা, আনার দানা।

বদরুজ্জামান আলমগীর : আনার দানা, সঙ্গে প্রাণের খেলা।

এ তাহলে একটি অলাতচক্র বোধকরি: সবটুকু একসাথে জানা, না-কী আলাদা আলাদাভাবে অজানার প্রজ্ঞা? যা আছে, তা নেই; যা নেই, তা তো অবস্থিতি করে আসলে। মার্কিন কবি

মার্ক স্ট্যান্ড এভাবেই বলছেন দেখি:

আস্ত রাখা।। আমি যেই মাঠের উপর দাঁড়াই /মাঠ গায়েব হয়ে যায়।

এটিই দুনিয়ার নিয়ম / যেখানেই দাঁড়াই / সেখানে ওটাই আমি / যা নাই হয়ে যায়।

যখনই হাঁটি / আমি বাতাস ভাগ করি,/ ফলে অন্য বাতাস সবসময়ই / জোরেশোরে বয় /একটু আগে আমি যেখানটায় ছিলাম / তা পূরণ করে।

আমরা সবাই / সরে যাই। / তার কারণ আছে। / আমি সরে যাই,/ চাই– অখণ্ডতা জারি থাকুক।

মার্ক স্ট্যান্ড: আস্ত রাখা।

বাইবেলের ল্যুক চাপ্টারে মোটের উপর প্রথম প্যারাবলের দেখা মেলে। খ্রিস্ট জন্মের বহু আগে জেরুজালেম থেকে জেরুকা যাচ্ছিল একজন সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। তার কপালে নাল্লত ছিল– ফলে সে ডাকাতের কবলে পড়ে। তারসঙ্গে না ছিল হীরা জহরত, না সুস্বাদু খাবার-দাবার। এইজন্য তার কপাল ভাঙে। ডাকাতদল তার কাছে তেমন কিছু না পাওয়ায় তিনগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে পথচারীকে বেধড়ক পেটায়।

প্রচণ্ড মার খেয়ে ছিন্নবস্ত্রে মরুভূমির ধুলার উপর লেপ্টে পড়ে থাকে মুসাফির। তার পাশ ঘেঁষে দুইজন মহাজ্ঞানী লেভাইট হেঁটে যায়। লোকটাকে পড়ে থাকতে দেখে দুই তর্কবাগীশ তাকে ধর্মের নানা মারফতি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। স্বাভাবিকভাবেই লোকটি কোন ওজনদার উত্তর দিতে পারেনি বলে তাকে ওখানেই ফেলে দুই তত্ত্বজ্ঞ নিজেদের আস্তানার দিকে চলে যায়।

একটুবাদে একই পথে কুলিকামিন জাতীয় এক সেমারিয়ান হেঁটে যায়। আহত লোকটিকে দেখে গোঁয়ার গোবিন্দ মুখ্যুশুখ্যু লোকটি তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়, নিজের আনিয়া থেকে জল ঢেলে খাওয়ায়, শুশ্রূষায় দিব্যি সুস্থ করে তোলে।

পরবর্তীতে যিশুখ্রিস্ট বহুবার এই গল্পটি বলে তাঁর অনুসারীদের নৈয়ায়িক শিক্ষার সুসমাচার জারি করেন।

ওই নৈতিক শিক্ষার প্রবাহ এখনও খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে চর্চিত হয়। ২০২১ নতুন বছর আবাহনে দুঃস্থ দুনিয়ার সামনে পোপ যে আশীর্বাণী দেন– তাতেও এর নির্যাস পাওয়া যায়।

নদী তার জল নিজে পান করে না; গাছেরা কখনও নিজেরা খায় না আপন গাছের ফল, সূর্য নিজের রশ্মিতে নিজেকে আলোকিত করে না, ফুল নিজের সুবাসে নিজে বুঁদ হয় না। অন্যের জন্য বাঁচা প্রকৃতির অন্তর্গত বিধান।

আমরা জন্মেছি একে অন্যের ভরসাস্থল হবার জন্য, যতো দুরূহই হোক না কেন– জীবন চমৎকার যখন তুমি সুখী; তা আরো মহৎ যখন তুমি অন্যকারো সুখের কারণ

হয়ে ওঠো। তাহলে এখন থেকে কথাটি মনে রাখি– পাতারা যে রঙ বদলায়– তা মনোরম, জীবনের নানা পরিস্থিতির বদল তাৎপর্যপূর্ণ–দৃষ্টিভঙ্গিটা স্বচ্ছ অনায়াস হলে এমনই মনে হবে।

তাই অভিযোগ অনুযোগ না করে বরং অনুধাবন করি– ব্যথা আছে মানে আমরা এখনো জীবিত, সমস্যা থাকলে তার অর্থই হলো– আমরা মোকাবেলা করার শক্তি রাখি, আর প্রার্থনার হাত ইঙ্গিত করে– আমরা একা নই।

আমরা যদি সত্য আর পরিস্থিতির এই ভিন্নতার মর্মটুকু অন্তরে ধরি তাহলেই বুঝবো– আমাদের মন প্রাণ, আমাদের জিন্দেগি আরো বেশি মূল্যবান, জীবন্ত আর মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

পোপ ফ্রান্সিস, ২০২১।

মুসা নবীর বয়ানে কোন প্যারাবল প্রায় নেই বললেই চলে। হযরত মুসা পূর্বনির্ধারিত নন– তিনি চলমান, তিনি জাল ফেলতে ফেলতে যান– এখনও সেই জাল গুটিয়ে তোলেননি; তিনিই একমাত্র নবী যিনি অর্ধেকটা শূন্যতা, বাকী অর্ধেক মাটি; কিছুটা মোজেজা বাকিটা বাস্তব, একভাগ নবী একভাগ মানুষ। মুসা নবীকে মনে হয়, ইতিহাসের প্রথম শ্রেণি সংগ্রামী নবী, বারবার তিনি ঈশ্বরকে তার নির্ধারিত আবাসভূমির কথা জিজ্ঞেস করেন– কিন্তু তিনি তার নির্দিষ্ট উত্তর পান না, মুসা পয়গম্বর এলাহীর দিদার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তা-ও নামঞ্জুর হয়। তাঁর জীবন কেটে যায় আবাসভূমির সন্ধানে অবিরল চাকার উপর। তাঁর পায়ের নিচে স্থির সিদ্ধান্তের অনড় নির্বান নেই, ফলে নেই প্যারাবলও।

ঈশ্বর মুসা পয়গম্বরকে আদেশ করেন পাথরের সঙ্গে অন্তর্ভেদী কথা বলতে– যাতে তিনি পাথরের অন্তরে জলের নহর দেখতে পান; কিন্তু মোজেজ পাথরটি ভেঙে দেখান পাথরের প্রাণে জল থাকে না- জমাটে বসে থাকে নিষ্প্রাণ শুষ্কতা।

তাওরাতের তুলনায় কোরানের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি স্থির। ফলে কোরানে অনায়াসে প্যারাবল, বা প্যারাবলাঙ্গিকে বিধানগুলো বিন্যস্ত দেখতে পাই।

বৃষ্টি জিন্দেগি। এই দুনিয়ায় চলমান, বীজমান, ফলপ্রসূ জীবন আকাশ থেকে নেমে আসা বৃষ্টি। মানুষের জীবন বারিবর্ষণসদৃশ। বৃষ্টির স্বভাবে মানুষ ধরাপৃষ্ঠে দাখিল হয়– নানা সম্পর্কে, সংসারে লিপ্ত হয়ে, ছড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টিকর্তার খলিফা সে গাছে, বীজে, আওলাদে ঘনবদ্ধ হয়। একদিন বৃষ্টির ফোঁটার মতই আবার শুকিয়ে যায়। যার ধন তারই সিন্দুকে আবার ফেরত যায়। এই সবই হয় সর্বশক্তিমানের অভিপ্রায় ও ইশারায়।

কোরানি প্যারাবল :বৃষ্টি জিন্দেগি। অনুলিখন: বদরুজ্জামান আলমগীর।

অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে ৪ মাজহাবের মধ্যে শাফেয়ি মাজহাবে কিছুটা ভিন্নতর কারণে প্যারাবলের ব্যবহার আছে। ইমাম শাফেয়ী আবু হানিফা, ইমাম মালেকের ফিকাহ শাস্ত্র মিলিয়ে একটি তৃতীয় মাজহাব গড়ে তোলেন। তার পূর্বের দুই ইমাম জ্ঞানে, গুণে ও শক্তিতে প্রভূত নির্ধারক থাকার কারণে শাফেয়ী মাজহাবে কিছুটা পরোক্ষে মাসালা প্রদান ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন পড়ে। ইমাম শাফেয়ীকে কিছুটা কৌশলী ও পরোক্ষতা আয়ত্ত করতে হয়। এ-জন্যই শাফেয়ী মাজহাবে প্যারাবলের চর্চা আসে।

নবী জমানার অনেক পরে বোর্হেস কী আশ্চর্য এক নিজস্ব নবুয়তি কায়েম করে বসেন। তারও মুসা নবীর মত নির্দিষ্ট কোন আবাসভূমি নেই। আবাসভূমি নেই হারুকি মোরাকামিরও। একটিই আবাসভূমির নাগরিক তাঁরা– সেই আবাসভূমির নাম– মন। মুসা নবীর দোটানা দেখি বোর্হেসে, কিন্তু হোর্হে লুইস বোর্হেস নিজের অভিজ্ঞান স্থির বলতে পারেন, কেননা, তিনি নিজেই ঈশ্বর, আর নিজেই তার অধীনে বান্দা, নিজে নিম্নমুখী দয়া, আর ঊর্ধ্বমুখী মায়াও তিনি স্বয়ং।

বোর্হেস ও আমি। সবকিছু ওই লোকটাকে নিয়ে ঘটে– লোকে যাকে বোর্হেস বলে ডাকে।

আমি বুয়েনেস আয়ার্সের রাস্তা ধরে সটান হেঁটে যাই– যন্ত্রচালিতের মতো দাঁড়িয়েও পড়ি মাঝেমধ্যে, প্রবেশ তোরণের নকশা আর গ্রিলের কারুকাজ একচোখ দেখে নিই। বোর্হেসকে আমি চিনি– চিঠির উপর এই নামটা দেখি, অধ্যাপকদের নামের তালিকায় এই নাম থাকে, আবার জীবনীকোষেও পাই।

আমার ওই গ্লাসগুলো ভালো লাগে– যেখানে উপরের অংশে বালু রাখা হলে আস্তে ধীরে বালু নিচের অংশে পড়ে– তাতে একঘন্টা সময় লাগে। মৌজার দাগ খতিয়ান, পুরনো হস্তলিপি দেখতে ভালো লাগে, কফির আমেজে দারুণ চাঙ্গা হয়ে উঠি আমি, স্টিভেনসনের গদ্যভাষা বড় টানে আমাকে– তার লেখায় এই ব্যাপারগুলো থাকে। কিন্তু কায়মনোবাক্যে না করার কারণে ফলাফল সন্তোষজনক হয় না– মনে হয়, একজন অভিনেতা এগুলো খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। আবার আমাদের দুজনের একদম সাপে-নেউলে সম্পর্ক, এটা বলাও ঠিক হবে না।

আমি আছি, সুখে-দুঃখে চলে যাচ্ছে; ওই কাগজে কলমের যে বোর্হেস– সে মনের মাধুরি মিশিয়ে লেখাজোখা করে; তার লেখাপত্রে আমাকে কবুল করে। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সে কিছু কাজের জিনিস করেছে, কিন্তু এইসব দলিল দস্তাবেজ আমাকে উদ্ধার করে দেবে না। কেননা, সত্যিসত্যিই যদি ভালো কিছু থাকে ওখানে– সেগুলো কারো হিস্যা নয়– এগুলো আমার নয়, সে-ও নিজের বলে দাবি করতে পারে না। কেউ-ই ভালো কোন কিছুর স্বত্বাধিকারী নয়– তার মালিক আমাদের ভাষা ও পরম্পরা।

মৃত্যুর হাতে আমার নিয়তি বাঁধা, একে পাশ কাটিয়ে সামান্য কিছুই হয়তো তার কলমে উঠে আসে। অবশ্য ছিঁটেফোঁটা করে আমার সবই ওকে দিয়ে দিয়েছি। যদিও আমি

জানি, সে নিরেট সত্যে কামড় দিয়ে থাকে না, লেখার খাতিরে খানিকটা নড়ে যায়, সরে যায়– কিছুটা বানিয়ে বলে। স্পিনোজা আলবৎ জানে– তাদের সজ্ঞায় এ-ব্যাপার তারা হেজ করে।

পাথর পারমার্থিকভাবে আবার পাথর জন্ম চায়, বাঘেরও অভিপ্রায় বাঘের জীবন অব্যাহত রাখা। আমিও আমার নয়– বোর্হেসের মধ্যেই থেকে যেতে চাই। আমি যদি আদপেই কেউ হয়ে থাকি– আমি তার বইয়ের মধ্যেই নেহায়েত জীবন্ত দেখতে পাই, আমি বরং নিজেকে অনুভব করি অন্যান্য কাজে; কেউ যদি মনেপ্রাণে গিটার বাজায়– মনে হয়, ওখানে বরং আমি নিজেকে বেশি খুঁজে পাই।

বেশ আগের কথা বলছি– একবার ভাবলাম, আমি বরং নিজেকে বোর্হেসের নাগপাশ থেকে খুলে নিই। করলাম কী– আগিলা কালের মায়াদারি পিছনে ফেলে সময়ের স্ফূরণ আর তার হাতে অনন্তের বাজি ধরে বসি– কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারি, ওই খেলোয়াড়ি বোর্হেসের দখলে; আমি ফতুর হয়ে গ্যাছি।

আমার হয়েছে শনির দশা– আমার সবকিছু হয় খুইয়েছি বোর্হেসের কাছে, নয় গ্যাছে সর্বনাশের হাতে। এই যে একপাতা লেখা হলো, আমি তা-ও জানি না– আমাদের দুজনের মধ্যে কে আসলে এটি লিখেছে!

হোর্হে লুইস বোর্হেস : বোর্হেস ও আমি।

এই এক অর্ধেক দুই অর্ধেক ব্যাপার নিয়ে আরো অনেককেই মোকাবেলা করতে হয়। বিশ্বাসী বনাম অবিশ্বাসীর তর্ক, কে আগে কে পরে সেই প্রশ্নও আছে, আশা কোনদিকে চায়– আবার নিরাশাও আগেপিছেই লাগোয়া থাকে। নিচের দুটি লেখার একটি দেনদরবার করে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর পাঠশালায়, আরেকটি বিজ্ঞান ও দর্শন, সংশয় আর অবিচল বিশ্বাসের রশি টানাটানি:

মাঝখানে কাটা ঈশ্বর। ব্যক্তির ভিতর বাহির, একজন মানুষের সামনে আরেকজন মানুষের প্রতিপক্ষতা, আসমান ও জমিনের ফারাক, বাস্তব এবং স্বপ্নের দ্বৈরথ– এগুলোর হাত ধরে মনের খোদা বনাম বনের খোদা, কসমিক ঈশ্বর এবং ক্লবের এলাহিকে মিলানোর দ্বন্দ্ব সমাজে, রাষ্ট্রে, দর্শনে এক অবিসংবাদিত মৌলিক দ্বন্দ্ব।

এমনই এক দোটানা মোকাবেলা করেন দার্শনিক, অধ্যাপক নিকোলাস ম্যাক্সওয়েল। তিনি দেখেন– মানুষের মনের ভিতরকার যে শুভবোধ তা নৈমিত্তিকতার ক্লান্তি, আয়াস, বাসনা, ক্ষুধা, বাৎসল্য, যৌনাকাঙ্খার মিশেল– তার ছন্দ, গতি প্রায়োগিক ও বহুধা অনুশাসন আর অভিব্যক্তিতে বাঙময়; তার থেকেও বড় কথা– তা পরস্পর নির্ভরতায় যৌগ।

অন্যদিকে যে ঈশ্বর কসমিক একচ্ছত্র ক্ষমতায় প্রতিভাত, অভিব্যক্ত– তা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক। একটি ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা উপরের নির্বিকার ব্যতিক্রমহীন নীতির সঙ্গে পায়ে পা মিলানোর

আদি প্রশ্নটিই মনের ধর্ম ও বইয়ের ধর্মের আসল মোকাবেলা।

এই খসখসে অমসৃণ পরিস্থিতিকে একটি পরিষ্কার পাটাতনে দৃশ্যমান করার জন্য নিকোলাস ম্যাক্সওয়েল ঈশ্বরকে মাঝখানে কেটে দুই ফালিতে রাখার পরামর্শ দেন।

ঈশ্বরকে দুইভাগ করে দেখা যাক, রাখা হোক– তাহলেই কার কোনদিকে যেতে হবে, সেই পথ আস্তে ধীরে খোলাসা হবে।

নিকোলাস ম্যাক্সওয়েল : মাঝখানে কাটা ঈশ্বর।

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ। বোধকরি বৈজ্ঞানিক সত্যের নৈর্ব্যক্তিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটু ভয় ছিল। তিনি সত্যকে বস্তুনিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না।

১৪ জুলাই ১৯৩০ সনে আলবার্ট আইনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যে আলাপ হয় তাতে বুঝি– রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু বিচার করার যে রেওয়াজ তার বাইরে যাননি।

আইনস্টাইন বলেন– জগৎ-সংসারে কেউ না থাকলেও অ্যাপোলো বেলভেডিয়ার একইরকম সুন্দর থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন– না, তা থাকবে না। মানুষের চোখের সমর্থন ছাড়া অ্যাপোলো বেলভেডিয়ার সুন্দর নয়।

আইনস্টাইনের উত্তর– তা হয়তো সৌন্দর্যের ব্যাপারে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্যের বেলায় নয়। কেউ দেখুক, কী না দেখুক– সত্য একা একাও সত্যই।

মানুষের অংশগ্রহণ বা আত্মিকতার বাইরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তাকে টেনে নিয়ে যাননি। আইনস্টাইন সংশয়ী হয়েছিলেন বটে, তাঁর কথায় একটু দীর্ঘশ্বাসের প্রলেপ ছিল; বলেছিলেন– বৈজ্ঞানিক সত্যের দিকে যাওয়াই তাঁর ধর্ম, তাই পিছন ফিরে তাকাননি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহত্ত্ব এখানেই যে, তিনি নিঃসঙ্গ হতে চাননি– তাই বারবার মানুষের দিকে ঘুরে দেখেন; আলবার্ট আইনস্টাইনের গরিমা ওখানে যে, তিনি পিছনে ফিরে তাকাননি।

বদরুজ্জামান আলমগীর : আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ।

ক্লান্তির পরেও কীভাবে জীবনমুখিতা গড়ে ওঠে– তার সন্ধানে নামলে ধন্দ লাগে। মানুষের জীবনে এক অদ্ভুত হার না মানা রোখ আছে– বোঝা গেলে অবুঝের জন্য কাতর হয়, ধোঁয়াশা থাকলে স্ফটিক স্বচ্ছতার জন্য জীবনপাত করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলবেয়ার কাম্যু। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবন জিজ্ঞাসার অস্তিত্ববাদী খোঁড়াখুঁড়ির রূপ দেখার নিরিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা এবং আলবেয়ার কাম্যুর দি প্লেগ উপন্যাসের পাশাপাশি পাঠ ব্যাখ্যা করে দেখা যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এ, আর আলবেয়ার কাম্যুর দি প্লেগ বেরোয় ১৯৪৭ সনে। দুটি উপন্যাসেরই অন্তর্লোক গড়ে ওঠে যুদ্ধোত্তর মানুষের বেঁচে থাকা,সংগ্রামশীলতা, মনস্তত্ত্ব, অসহায়তা ও ব্যক্তিচৈতন্য আর ঈশ্বরের ঘাত প্রতিঘাত ভালোবাসা নিয়ে। মানুষের ক্ষমতা, দুঃখ পাবার বৈধতা আর অন্যায়, ঈশ্বর ও মানুষের অধিকার, অনধিকার এবং সম্পর্কের বাস্তবিক দয়া ও রুক্ষতা– এই দুই উপন্যাসের নাজুক জমিন গড়ে তোলে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকা গাওদিয়া, আলবেয়ার কাম্যুর অঞ্চল আলজিরিয়ার ওরান শহর। দু'জায়গাতেই আছে দোটানা, তীব্র যাতনা ও সঙ্কট। দুটো উপন্যাসেই নানা আঙ্গিকে, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ঈশ্বরিয়ানা বনাম বিজ্ঞানের অভিজ্ঞানকে মোকাবেলা করা হয়েছে।

প্লেগে ডাক্তার বার্নাড রিউক্স, পুতুল নাচের ইতিকথায় কলকাতা ফেরত ডাক্তার শশী বিজ্ঞানের শ্রমসাধ্য পরশপাথর হাতে মোকাবেলা করেন মড়ক ও মারী; অন্যদিকে পাদ্রী পেনিলোক্স মানুষের বানানো ওষুধে সেরে উঠতে অস্বীকার করেন– এমনকী তাঁর মৃত্যুর পিছনে রহস্যের মায়াবী পর্দা দোলে, একটি জোরালো সন্দেহের বীজানু থেকেই যায়– ঈশ্বরের আধিপত্য প্রমাণ করার জন্য ফাদার হয়তো নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; একইভাবে পুতুল নাচের ইতিকথায় ঠিকঠিক রথের দিন যাদব পণ্ডিত তাঁর বিশ্বাস ও সংস্কারের জয় দেখতে ইচ্ছামৃত্যুগ্রহণ করেন।

বস্তুবাদী ডাক্তার রিউক্স দেখেন ফাদার পেনিলোক্স অতিমারীতে শিশুর মৃত্যু দেখেও কেমন অবিচলিত– বরং স্থির ধৈর্য্য ঐশ্বরিক ক্ষমতার একচ্ছত্র মহিমায় নির্বাক, ডাক্তার শশীর প্রাণান্ত চেষ্টার পরও ভূতো, ক্ষেমির মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নেমে আসা ধারালো হিম মৃত্যুর পরোয়ানা দেখেন অসহায় শশী।

এভাবেই জীবন ও মৃত্যুর ধ্রুপদী সিদ্ধান্ত রচিত হয়ে ওঠে। কুসুমের বাবা শশীকে বলেন, সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর এক, চিরকাল এমনিই দেখে আসছি ডাক্তার বাবু। পুতুল বৈ তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।

বদরুজ্জামান আলমগীর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলবেয়ার কাম্যু।

যে পরাজিত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয় সে-ই কী আসলে জিতে আসে, পোড়খাওয়া সমন্বয় সাধন করে? নিচে পরপর এমনই কয়েকটি অন্বেষার দলিল।

পতঙ্গ। উইপোকাদের হাটে একটা তাগিদ ওঠে– কে বাতির আগুন পরখ করে তার স্বভাবের তালাশ দিতে পারে?

প্রথম উই মোমের চারপাশ ঘুরে এসে রিপোর্ট দাখিল করে: বাতিটা একটা মুকুট যার উপর সূর্যালোক পড়ে ঝিকমিক করে। সরদার বলে, তুমি তো কাছেই ঘেঁষোনি, দূর থেকে উঁকি মেরেছো।

এবার দ্বিতীয় উইয়ের পালা– সে পাখনা মেলে পতপত করে ঘুরে আসে। বেচারিকে বড় অস্থির দেখায়। আইডাই খবর বলে: সে এক বিরাট ইতিহাস। আমি ওখানে সটান উড়ে যাই, দূরত্ব বজায় রাখি। কয়েক ঘন্টা বিষয়টি ঠাহর করি– রীতিমতো গায়ে একটা গরম আঁচ এসে লাগে, এই তাপই আমাকে ঠারেঠুরে আগুনের কাছে যেতে বারণ করে। আমি আলোর মধ্যে একটা সোনালি গুল্লি দেখতে পাই, আর কী হুজ্জতি বলো দেখি– ওই গুল্লির ভিতর একখণ্ড নীলা ঝিলমিল করে!

সরদারের কণ্ঠ এবারও জলদ গম্ভীর–তুমিও দূরেই গোত্তা খেয়েছো– তার দিলের খবর আনতে পারোনি।

বেহিসাবি তিন নম্বর পতঙ্গ সোজা উড়ে যায় বাতি বরাবর, তার শিখা বেড় দিয়ে ধরে। মথদের কেউ কেউ চিৎকার চেঁচামেচি করে, অনেকে ভয়ে নিজেদের চোখ ঢেকে ফেলে। কিন্তু সরদারজি সবাইকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দেয়– একমাত্র ও-ই আগুনের অন্দরমহলের খোঁজ জানে।

তৃতীয় উই বাতির জ্বলন্ত সলতে আঁকড়ে ধরে, তারপর ফিরে আসে উই নয়– একখণ্ড শিখা উড়তে উড়তে সরদারের কাছে ফিরে আসে; পতঙ্গ আর আগুন আলাদা নয়– দোঁহা মিলে একটি লকলকে বহ্নিশিখা– আগুনের আলজিভ নীলাপাথর নয় আর– এক শুচিশুভ্র নিশানা।

জো মার্টিন : পতঙ্গ।

এক চিলতে বিবমিষা। এটা আমার মুখের ছাপ। মাঝেমধ্যেই এই নিষ্ফলা দিনগুলোতে ব্যাপারটা ভেবে দেখি: আমি নিজের মুখমণ্ডল থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারি না। অন্যদের মুখাবয়বের তা-ও কিছু একটা অর্থ আছে, আছে কিছু স্পষ্টতা। আমারটা একদম ফাঁকা, অর্থহীন।

আমি সুদর্শন, না কিম্ভুত– সেটিও বুঝে উঠতে পারি না। মনে হয় কুৎসিত– আমি এমনই শুনে আসছি। কিন্তু এতে আমার কিছুই যায় আসে না।

মনে মনে আমি বরং অবাকই হই– যা হোক একটা কিছু তো ঠাওরেছো আমাকে, অন্তত তুমি একটা মাটির ঢেলাকে, বা ইটের টুকরাকে সুন্দর বা কুৎসিত বলেছো।

জাঁ পল সার্ত্রে : এক চিলতে বিবমিষা।

এমনও দুর্দিন হয়– নিসর্গের বিবমিষা লাগে। নিজের হাত কেটে রক্তাক্ত করে, কখনও বা কেউ ব্লেডে কাটে পুর্নিমার অঢেল জ্যোৎস্না, একচাঁই তমসা কেটে তার নিচে শুয়ে থাকে মন-কেমন-করা রাজকুমার, মাটির রাজকুমারী। তাদেরই চিহ্নাবলি নিচের লেখাগুলোয় অবশে, ক্ষিপ্রতায় জমাট বেঁধে থাকে।

সময় সবুজ ডাইনি। সময় সবুজ ডাইনি, পৃথিবীর উপকণ্ঠে থাকো, /নাবিকের হাড় দিয়ে সন্ধ্যার উঠোনে তুমি / ভাঙা নাবিকের ছবি আঁকো।

রণজিৎ দাশ : সময় সবুজ ডাইনি।

আমি বাঙালি এবং মালাউন। বাজার থেকে কয়েকটা দেশলাই কিনলাম / এখন একটার পর একটা পোড়াচ্ছি / কিছুতেই আগুন ধরছে না / কৃষ্ণদাগ ঘন হচ্ছে / স্বাধীন বাংলার কপাল খা খা করছে.../ আর আমার ঠাকুরমার সিঁদুরের কৌটা হতে / একদা লাল লাল বসন্ত ঋতু বেরিয়ে আসতো / এখন বেরিয়ে আসে পোড়া মানুষের গুঁড়ো /আমি বাঙালি এবং মালাউন / শঙ্খধ্বনি ছাড়া আমার রক্তে আগুন ধরে না।

মুনিরা চৌধুরী : আমি বাঙালি এবং মালাউন, মেহকানন্দা কাব্য।

আধুনিক রাষ্ট্র।। রাত্রির গুহায় আতঙ্ক, ঋণ, দুর্ভাবনা শেষে কতো ভাষা ও বাসনা নিয়ে প্রতিটা দিন শুরু করি; কিন্তু হায়, দিন যেন সূর্যালোকের হাত ধরাধরি করে চলে; সূর্যপ্রভার বদান্যে সবকিছু স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে ওঠে, চারদিক সুনসান পরিষ্কার অভিব্যক্তি নিয়ে উপস্থিত, আর যায় কোথা!

এক আঙিনায়, এক অপ্রতিরোধ্য রোখে এক সমন্বয়, স্বজনপ্রীতি, সংঘ, সমিতি, সভা, লেফট-রাইট, দল ও দলিলসহ এক মাংসাশী রাষ্ট্র হুংকার দিয়ে চারদিক থেকে নৃশংস উল্লাসে জেগে ওঠে! আমি কুঁকড়ে শামুকের মতো সেঁধিয়ে যাই – আবার রাত্রি-দিনের তফাৎ মুছে কালো এসফল্টের নিশি ঝোঁকে বসে!

এ-কেমন নিকষ রাত্রি– দিনের আভা দাবড়ে নিয়ে আমার চোখে ঔদাসীন্যের পেরেক ঠুকে দেয়; কীভাবে এতো রাষ্ট্র, দণ্ড ও দণ্ডবেড়ি, কিরিচের পিছনে রাষ্ট্র, হন্তারকের সামনে রাষ্ট্র, আকাশে পাতালে অন্তরীক্ষে, ইলিশের পেটে ডিমের মধ্যে রাষ্ট্র; বেডরুমের বিছানার চাদরে প্রিন্টের জমিনে সংবিধান, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির শব্দেও লেফট রাইটের বুটের আওয়াজ– বড় হাঁসফাঁস করি– এ আস্তরণ সরিয়ে নাও : আম্মাগো পানি দাও ফেটে গেল ছাতিমা!

বদরুজ্জামান আলমগীর : আধুনিক রাষ্ট্র, হৃদপেয়ারার সুবাস।।

বর্ণে বর্ণে রচিত।। মানুষ আশরাফুল মাখলুখাত হিসাবে নিজেকে প্রকৃতির উপর, জগতে সংসারে, আসমানে জমিনে অন্তরীক্ষে একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাসনে বলবত করেছে। এই আত্মঘাতী বিজয়ে তাকে উল্লসিত হতে দেখি।

আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অন্দরমলে লাগানো সংবেদের আয়নায় যদি দেখি, কী মিলিয়ে আনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রুনো লাতুই ও আরো অনেক ভাবুক দার্শনিকের চিন্তাসূত্রের সনে– তাহলে সহজেই বুঝতে পারি–প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করে তার উপর যে সামরিক বিজয় চাপিয়ে দিয়েছে মানুষ– তাতে সে আসলে মহান বিজয়ের নামে ঘরে তুলেছে পরাজয়ের নিঃসঙ্গ তকমা।

বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে উৎপাদন করছেন রোবট মৌমাছি– যারা ফুলের পরাগায়নে মৌমাছির বিকল্প হবে, তারা মধু আহরণ করবে না কিন্তু একফুল থেকে আরেক ফুলে পরাগায়ন ঘটাবে। এটি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়– বরং এই জুয়াড়ি, ভেক্সিনেটেড ধনতান্ত্রিক ভোগবাদী দুনিয়ার একটি একচেটিয়া দখলদারি।

এভাবেই যৌনতা আর আধ্যাত্মিক এভিনিউ নয়, বরং একটি ক্ষমতায়নের বিন্যাসে এসে ঠেকে। ওগো রোবট মৌমাছি, তমাল তলার রাধা তাহলে কাকে বলবে তার অশ্রু দিয়ে লেখা কাঁপাকাঁপা ভুল বানানে তোলা দু'টি কথা– ভ্রমর কইও গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া!

বদরুজ্জামান আলমগীর : বর্ণে বর্ণে রচিত।

যে ডিঙিয়ে এসেছে বহু পথ, উত্থান-পতন, জিতে এসেছে বাজারের ঢোল ও করতাল, রঙিন বিরঙিন প্রতিযোগিতা, তার ভিতর মানুষ হয়তো খেয়ালই করেনি কখন বুকের খাঁচার ভিতর অগোচরে গড়ে তুলেছে এক গণ্ডারের খামার, উজাড় করে দিয়েছে বোনের মায়ার মতো সবুজ বন, সারাটা দুনিয়া চিবিয়ে খায় মুঠোর ভিতর। এভাবে জনান্তে গড়ে ওঠে পরিশ্রান্তির দানা– জনমিতি।

মোবাইল ফোন কী কী খাইছে। মোবাইল ফোন কী কী খাইছে– ঘড়ি খাইছে, ক্যামেরা খাইছে, ল্যাপটপ খাইছে, রেডিও খাইছে, টিভি খাইছে, টেপ রেকর্ডার খাইছে, ক্যামেরা খাইছে, টর্চলাইট খাইছে, ক্যালেন্ডার খাইছে, এলার্ম খাইছে, ক্যালকুলেটর খাইছে, সিনেমা হল খাইছে, ধ্যান খাইছে, জ্ঞান খাইছে, বই খাইছে, নোট বুক খাইছে, ঘুম খাইছে, পড়াশোনা খাইছে, অপেক্ষা খাইছে, পীর খাইছে, মুরিদ খাইছে, চোখের পানি খাইছে, মুখের হাসি খাইছে, অনুভূতি খাইছে, অপেক্ষা খাইছে, আনন্দ খাইছে, বিষাদ খাইছে– আর আমি নিজেও জানি না– কোনদিক দিয়া আমারে খাইছে!

পাবলিক প্যারাবল : মোবাইল ফোন কী কী খাইছে। (সংগৃহীত)

লোকজ্ঞান, লোক অভিজ্ঞান এক অসামান্য ধন আমাদের সমাজে; কেবল আমাদের সমাজের কথা-ই শুধু কেন বলছি– সমগ্র দুনিয়াজুড়েই তা এক আস্থা, ভরসা, স্নেহ বাৎসল্যের বারামখানা। কখনো কখনো হয়তো তাদের শুধুই বচন প্রবচনের মতো শোনায়– যা আসলে হাজার বছরের পরম্পরা, যৌথতার ভিতর জন্ম নেয় সে-সকল প্রতীতি, অভিজ্ঞতার নির্যাস, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা, দর্শন।

কাজের মাপ রিজিকের বেড়।। অজিফা কাজ করে, খালি কাজের গোড়ায় কাজ, কামের পিঠে কাম। তাকে দেখলে মনে হয়, সোনামুখি সুইয়ের সামান্য ছিদ্রে বুঝি আস্তকুড়াল এফোঁড়-ওফোঁড় করেই তবে শান্ত হবে। অজিফা এই ঘর ঝাঁট দেয় তো গাছের গোড়ায় পানি ঢালে, পানি ঢালা শেষ হতে না হতেই ঘর লেপামোছায় বসে, একফাঁকে টিউবওয়েল থেকে দুপুরের রান্নার জল এনে রাখে, হাঁসের জন্য শামুক কেটে দেয়। এর মধ্যে বাড়ির দেউরির ওপাশে ভিখারি এসে ভিক্ষার হাঁক দেয়। দৌড়ে ভিখারী মাজরালিকে ফুরায় করে দুইমুঠ চাল দিয়ে দৌড়ে অজিফা আবার কাজে আসতে যাবার মুখে মাজরালি বলে, শোন মা, এই দেখ আমি আস্তে আস্তে হাঁটি– বাড়ি বাড়ি থামতে আমার ভালো লাগে, প্রত্যেক বাড়ির আলাদা আলাদা গন্ধ আছে, সব সুবাসের রিজিক হইলো আমার নাক। আমি যদি বুক ভইরা শ্বাস না লই তাইলে তাদের রিজিক মারা যায়। কাজেরও আয়ু আছে, সীমানা আছে, তোমার তকদিরে কাজের ভাগ আছে, হিস্যা আছে। এতো তাড়াহুড়া কইরো না মা, তোমার ভাগের কাম শেষ তো তোমার আয়ুও শেষ, উপরওয়ালার নিয়ামত আমরা কীভাবে পায়ে ঠেলি কও?

জনমিতি প্যারাবল : কাজের মাপ রিজিকের বেড়। (সংগৃহীত)

মওলানা ভাসানী একবার কৃষক সমাবেশ করতে গেলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ষণ্ডারা সভায় বাধা দেয়। মওলানা প্রশাসনকে বলেন, ঠিকাছে তোমাদের কথা-ই সই, আমি মিটিং করবো না, বক্তৃতা দিবো না; আল্লার দরবারে মোনাজাত করবো।

তিনি সভাস্থলে বক্তৃতার বদলে আল্লার কাছে হাত তুলে ফরিয়াদ শুরু করেন, সেখানে জালিম আইয়ুব শাহীর পতন চাওয়া থেকে, পাষাণ দুর্মরের হাত থেকে রক্ষা পাবার সমস্ত বক্তব্যই উপস্থিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কিছুই করার ছিল না, কেননা কাঠামোগতভাবে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিষোদগার করেননি, বা কৃষককে ক্ষেপিয়ে তুলে কোন বক্তৃতাও করেননি। কেবল মোনাজাত করেছিলেন– কিন্তু মোনাজাতের ভিতর পরোক্ষে, সমস্ত সারবত্তাই হাজির করেন। প্যারাবল এমন একটি নিরাপোষ ডিসকোর্সের নাম–সুরের জন্ম গানের বাণীকে এক স্থির অতলে ঘনবদ্ধ করে।

নৈঃশব্দ্যের নন্দনতত্ত্ব।। সব যুগেই সময় নিজে মরমিয়ার একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এই মরমিয়া মানুষের কল্পনা, চিন্তা ও আশার আকার ভাষা বিন্যাসে দ্বান্দ্বিকভাবে

জমাট বাঁধে– যা চেতনাধারার এক নতুন বিকশিত গড়ন।

সুজেন সনট্যাগ : নৈঃশব্দ্যের নন্দনতত্ত্ব।

জগতে হাঙ্গামা আছে, মাঝেমাঝে তার প্রয়োজনও পড়ে। কিন্তু শোরগোলের ঠিকানা শেষাব্ধি নৈঃশব্দ্যই। লালন সাঁইজির যেদিন নিঃশব্দ শব্দরে খাবে– এই কালামের অভিঘাত কী মৌন গভীর! বোর্হেসের অমূল্য কথাটি মনে পড়ে– যে কথার আওয়াজ নৈঃশব্দ্যকে উসকে দেয় না– এমন কথা বলো না– নীরবতা বুঝি ক্লদ মনে'র চিত্রকর্ম – গাছের শাখারা কাঁপে একা ও একসঙ্গে।

হ্রদের উপর বিছিয়ে থাকা শাপলার পাতাটি পতপত করে জলের পাটাতনে বাড়ি খায়, কোত্থেকে জানি এক ঘুর্ণি হাওয়া বয় শনশন, গাছের ওপাশে বুক কাঁপিয়ে শিস দেয় রবিন–কিন্তু সবার এই সম্মিলিত সরব সচলতা নির্মান করে এক পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্য, নীরবতা।

মন্ত্রীর নির্জন আবাসের সংকল্প।। জালালউদ্দিন রুমি কোলাহল ছেড়ে নীরবতার বারামখানায় লুকাতে যান না। কোলাহলের ভিতরেই বীজের বীক্ষায় নিজেকে ধ্যানের মাটিতে রোপণ করে দিতে পারেন– গার আমিনাম মোত্তাহাম নাবুয়াদ আমিন, গার বগুয়্যাম আসমাঁরা মান জমিন : আমি যদি তোমাদের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে থাকি তবে আমার প্রতি তোমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিৎ নয়, যদিও আমি আসমানকে জমীন আর আকাশকে পাতাল বলি।

গার কামালাম বা কামাল এনকার চীস্ত অর নিয়াম ঈঁ যহমত ও আযার চীস্ত : আমি যদি পীরে কামেল হয়ে থাকি তবে আমার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আর আমি যদি পীরে কামেল না হয়ে থাকি তবে আমার পিছনে তোমাদের এ কষ্ট-ক্লেশ ভোগের প্রয়োজন কি?

মান না খাহাম শুদ আযী খেলওয়াৎ বেরুঁ যাঁকে মশগুলাম বা আহওয়ালে দরুঁ : আমি নির্জন-বাস হতে বের হবো না। কারণ, আমি কোলাহলেই আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহে ডুবে আছি।

জালালউদ্দিন রুমি : মন্ত্রীর নির্জন আবাসের সংকল্প, মসনবী শরীফ।

কী সেই পরশপাথর– আমাদের তা জানা নেই। উজান ঠেলে গুগলির বদলে কোনদিন পাওয়া যাবে বাসনার মুক্তাওয়ালা ঝিনুক– কে তার খোঁজ জানে– কী সন্ধানে যাই সেখানে আমি কী সন্ধানে–

জন স্টাইনবেক তাঁর মুক্তা উপন্যাসে এমন একটি জীবনবৃত্তান্ত এঁকেছেন– তাতে

একটি প্যারাবল গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত যেন দেখতে পাই।

কিনো সমুদ্রের কাছে একটি মুক্তা খুঁজে পান। আদিবাসী গড়নে গড়ে ওঠা কিনো, তার সারল্য, সংসার জীবন, নবজাত পুত্র কয়োটিটো, স্ত্রী হুয়ানা সবমিলে যে জীবন তার মধ্যে সমুদ্রে পাওয়া মুক্তাদানাটি যেন এক বিপুল হুল্লোড়ে আলোড়ন ঢেউয়ের অভিঘাত নিয়ে আসে।

অনেক ঘটনা উপঘটনার ভিতর কিনো আর বুঝি আদিবাসী সারল্যের নিরঙ্কুশ পারম্পর্যে অটল থাকতে পারেনি। পূর্বপুরুষের দাবি, সহজ জঙ্গমতা থেকে ছিটকে পড়ে। জন স্টাইনবেক কিনোর মুক্তাদানার ফলে বিচলনকে আদিবাসী সমাজে আমেরিকার অনুপ্রবেশ হিসাবে একটি সমান্তরাল বয়ানে বিবৃত করেন।

উপন্যাসের শেষে দেখি– কিনোর লোভের কারণে তারা নবজাত কয়োটিটোকে হারায়। সন্তানের মৃতদেহ কাঁধে কিনো আর হুয়ানা আবার সমুদ্রের ঢেউয়ের কাছে যায়–কুড়িয়ে পাওয়া মুক্তা আবার সাগরেই ছুঁড়ে ফেলে কিনো।

কালের টানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে লোকধর্মের একটি বিস্তর ফারাক হয়ে গিয়েছে– বুকের : বইয়ের ধর্ম আর বুকের ধর্ম আকারে, ইঙ্গিতে, সুবাসে এক জায়গায় নেই। ফলে বাইবেলীয় নৈয়ায়িক অবস্থান থেকে যে প্যারাবল শুরু হয়েছিল তা নানা রূপকারের হাতে বিপুল পার্থক্যে, জৈবিক চাষাবাদে মেলা ফসল ফলিয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের জায়গায় কখনো প্যারাবল এমনকী তার প্রতিপক্ষতা নিয়েও দাঁড়িয়েছে। নিচে তার একটি নমুনা।

ধর্মেরগ্রহণ।। মা-বাবার কোলে জন্মসূত্রে আমি মুসলমান; ইতিহাসের মাতৃক্রোড়ে জন্মানো আমি হিন্দু; জীবনের বিপনীকেন্দ্রে লেনদেন ও মিথষ্ক্রিয়ার কল্যাণে সর্বধর্মের জাতক আমি; ইচ্ছার সংকল্পে সর্বপ্রাণ শূন্যতাবাদী।

যেখানে যে আক্রান্ত - তার অন্তরের রক্তক্ষরণটিই আমি আমার ধর্মে গ্রহণ করি।

সব ধর্মই আমার ধর্ম - কোন ধর্মই আমার ধর্ম নয়।

সত্য কবরের নিঃসঙ্গতায় নিজস্ব, সত্য নিজেই নিজের প্রতিপক্ষ!

বদরুজ্জামান আলমগীর : ধর্মের গ্রহণ, হৃদপেয়ারার সুবাস।

প্যারাবলে খ্রিস্টীয় সুসমাচার গ্রহণ করেন কোহলিল জিবরান, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর উপসংহারে অভ্রান্ত বাইবেলীয় পরিকল্পনা তুলে আনেন অক্টাভিয়া বাটলার; কিন্তু খ্রিষ্টীয় নীতিশাস্ত্র পরিহার করেন ফ্রানৎস কাফকা, প্যারাবল লেখায় শিল্পবোধই প্রধান ও শেষ বিবেচনা হোর্হে লুই বোর্হেস-এর বেলায়, কালের বিন্দুবিন্দু জরুল ইটালো কালভিনোর সিদ্ধি, পাওলো কোয়েলহো ইতিহাসের কেন্দ্রে গঠিত হওয়া শুভবোধে নিষ্ঠ– তাঁর মধ্যে

গহীন ভিতরে হয়তো খ্রিষ্টীয় মনোনয়নের একটি দূরবর্তী পোঁচ দেখা যায়।

অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের মধ্যে নৈমিত্তিক জীবনের চেনা বাস্তবের অচেনা, অতল ব্যাখ্যাও দুর্লক্ষ্য নয়।

বিপদজনক নিরাপত্তা।। দুই জেন গুরু ম্যাঙ গঙ আর কিয়ঙ হো এক বনের ধার ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে। তাঁরা বৃষ্টিজলের হাত থেকে বাঁচার জন্য দ্রুত বনের কিনারে একটি ঘরে আশ্রয় নেয়। পুরো ঘরটি পাথর বসিয়ে বানানো।

একটু বাদেই কিয়ঙ হো বারবার ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখে। ম্যাঙ গঙ তাতে কিছুটা শঙ্কিত আর উৎসুক বোধ করে, ম্যাঙ গঙ কিয়ঙ হো-কে জিজ্ঞেসই করে বসে– এই ঘর খুব শক্ত সাবুদ–তুমি বারবার উপরের দিকে কী দেখো?

কিয়োঙ হো বলে–তুমি ঠিক বলেছো। পাথরের চাঁইগুলো খুব পোক্তভাবে লাগানো, তাই এই ছাউনিও খুব নিরাপদ। কিন্তু নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বিপদজনক।

জেন প্যারাবল, বাঙলা তরজমা: বদরুজ্জামান আলমগীর

প্যারাবলের এই বাস্তবানুগ অনুসন্ধিৎসা আমাদের জানান দেয়– প্যারাবল যতোটা না নিরেট সত্য তারো অধিক সত্যাভিমুখিতা। আধুনিক নৃবিজ্ঞানের এই দাবিই যেন প্যারাবলেরও পাটাতন। নিরেট অনড় সত্য বলে কিছু নেই– কেবল সত্যের দিকে অভিযাত্রা আছে। ট্রুথ ইজ নট দি গোল– গোল ইজ ট্রুথফুলনেস।

নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার-এর বিবেচনাটি এখানে উল্টেপাল্টে দেখা যায়: পিন্টার বলেন– সত্য কখনো একটি নয়– সত্য বহু; এবং সত্যকে অনেক কোণ থেকে আলো ফেলে দেখা যায়; অসত্যও তেমনি একটি ব্যাপার। জৈন ধর্মেও এমন একটি কথাসার আছে– সত্য একটি নয়, অনেকগুলি সত্য একসঙ্গে থাকে।

কেউ যদি বলেন, মানুষ মারা যায়– এটি কী নিরেট সত্য নয়? এর উত্তরও এক ঝটকায় দেয়া যায় না বোধ করি। সুফী সাধক তাঁর পদে বলেন– জীবনের নামে মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, মৃত্যুর ভিতর সে জেগে ওঠে।

যে সত্যিকার গুরু সে কখনও আংশিক হয় না, সে সত্যের একপাশ বা কোন একটি পক্ষ নয়; তিনি সাধু ও গুনাহগার– দু'জনকেই একসঙ্গে বিচার করেন : লাও জু।

নির্বিকার বিন্দুটি।। কৃষ্ণ মাত্র ১৬ বছর বয়সে বাঁশি বাজানো ছেড়ে দেন। তিনি যখনই বোঝেন রাধার মন তমাল গাছের একটি পাতা বুঝি কেঁপে উঠেছে, তখনই বাঁশিটি রাধার হাতে তুলে দিয়ে একটি দূরত্বের রঙে লুকিয়ে যান। এভাবেই লীলাবান কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তর লাভ করেন।

আবদুল হাই বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে জলের ঢেউয়ে মিশে মৃগেল মাছের চোখের মণিতে সিদ্ধ হন; মৃত্যুকে পরিধান করে আবদুল হাই মেঘের ধামে বিদ্যুতের পদ্মহেমে লোকান্তরে মেশেন। রঙমালা বেগম প্রতিদিন গণক ডেকে দিশা গুণিয়ে দেখেন– কবে আহা, তার সাধু হাই বাড়ি ফিরবেন! চুলার আগুন একা একা তরকারি পুড়ে ফেলে, কিন্তু তার আঁচ তাকে ঘুনাক্ষরে স্পর্শও করে না। এভাবে রঙমালা একটি স্থিরবিন্দু, নির্বিকার ঈশ্বর হয়ে ওঠেন।

সন্ধ্যা গড়িয়ে ঢালুতে নামতেই প্রতিদিন নিরুপমা পিসিমার জ্যোৎস্নার ডালি সাজাতে ইচ্ছা করে। দুধেদুধে অন্ধ দুনিয়া দেখতে নিরুপমা পিসিমা ঝামায় কাসার থালাটি ঘষেন– ফলে থালা ঝকমক করে ওঠে। কাহার তরে জানি মায়াপাত্রে জ্যোৎস্না তুলতে দরজার দিকে যান। পিসিমা ভুলে যান, কবেই ওই দরজা আদিঅন্ত কালের জন্য বন্ধ হয়ে গ্যাছে!

পিসিমা নির্বিকার। নিরুপমা পিসিমা এভাবেই ভগবান হয়ে ওঠেন।

বদরুজ্জামান আলমগীর : নির্বিকার বিন্দুটি, হৃদপেয়ারার সুবাস।

প্যারাবল নিয়ে।। অনেককেই অনুযোগ করতে শুনি– আপ্তবাক্য কেবল সুবচনের বাহার, এগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোন কাজে আসে না। প্রজ্ঞাবান মানুষটি বললেন: আগাও, এই কথার ভিতর দিয়ে তিনি কিন্তু বাস্তবিক গজফিতায় মাপা কোন জায়গা অতিক্রম করে যেতে বলেননি; রথে কুলালে আমরা অবশ্য তা করতেই পারি; কথা সেটা না– ঋষি মানুষটি বোঝাতে চেয়েছিলেন অজানার উদ্দেশে পা বাড়াও– এমন কিছুর ইঙ্গিত তিনি করছিলেন– যা তার নিজের কাছেও গাণিতিকভাবে পরিষ্কার নয়, এইজন্য তাঁর পক্ষে প্রায়োগিক কোন নির্দেশনা দেয়াই সম্ভব নয়। প্যারাবল ব্যাপারটাই তাই– যা আগাপাশতলা বোঝা যায় না– তা বোঝার জন্য কুস্তি করা বৃথা– একথা কে না জানে! তবুও দিনানুদিন ভালো কিছু করার জন্য মনেপ্রাণে চেষ্টা করতে হবে– সেটা অন্য ব্যাপার।

একজন তো মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলার দশা, বলে কী– এতো গড়িমসি কেন? তুমি যদি সবকিছুর মধ্যে কেবল আপ্তবাক্যের মাজেজা নিয়েই পড়ে থাকো– তাহলে তোমার হাড়ভাঙা খাটুনির সবটাই ভেস্তে যাবে, আর তুমি নিজেই একখান অনড় আপ্তবাক্যে বদ্ধ হয়ে পড়বে!

এ-পর্যন্ত শুনে একজন বললো: আমি বাজি ধরে বলতে পারি– এটিও একটি প্যারাবল।

প্রথমজনের উত্তর: তুমি জিতেছো।

দ্বিতীয় জন বলে: আফসোস– জিতেছো, কিন্তু তা-ও আপ্তবাক্যের ময়দানে।

প্রথম জন কহে: না, বাস্তব সত্য এই– প্যারাবলে তুমি হেরেছো।

ফ্রানৎস কাফকা : প্যারাবল নিয়ে

মুজালি ফকির।। কেউ কোনদিন মুজালি ফকিরকে পরিপূর্ণভাবে হাসতে দেখেনি। হাসির কথা বললেই ফকির রহস্য করে একটুখানি হাসে, আর বলে, সব হাসি সেইদিনের জন্য তুইলা রাখচি; সে-দিনই হাসবো যেদিন আমার রাই-এর দেখা পামু।

অবশেষে মুজালিকে সবাই হাসতে দেখে।

মুজালি ফকির আরাম করে হাসে– যেদিন মরণ তার সামনে এসে দাঁড়ায়!

বদরুজ্জামান আলমগীর : মুজালি ফকির, দূরত্বের সুফিয়ানা।

নিজের সঙ্গে নিজের দেখা, সমাজের দেখা, রাষ্ট্রের দেখা, দুনিয়ার দেখা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর দেখা। এভাবেই প্যারাবলে হয়তো ইতিহাসের ব্লাইন্ডস্পটগুলো ধরা পড়ে।

ভবাপাগলা নিজেকে দেখার জন্য নিজের থেকে সরে আসেন। নিজের জীবননদী দেখার জন্য নদী থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে তার প্রবাহটি দেখেন। কার্ল মার্কস শ্রেনীচ্যুতির ভিতর দিয়ে নিজেকে দেখার ও প্রাসঙ্গিক অবস্থান নেবার কথা-ই বলেন।

ইটালিয়ান প্রবাদ– খেলা শেষে রাজা ও সৈনিক একই বাক্সে যায়: যদি এই প্রবাদ অন্য একটি ঘটনার পরিণতি ও ফলাফল বর্ণনা করতে রূপকার্থে বলা হয় তাহলে সে হবে প্যারাবল।

জগতে আছে ভালো আর মন্দ, সাদা ও কালো, উত্তম এবং দুষ্টাচার– এই দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু নাই।

ইতিহাস বলে, যেমন লুম্পেন সর্বহারা আছে, লুম্পেন বুর্জোয়াও আছে, সাধু আছে, সাধুবেশ ডাকাতও আছে। মনে হয় মুক্তিদাতা, কিন্তু আসলে আটককারী। এইগুলোর ফোকরে, জালিয়াতি, চালিয়াতি, খানেদজ্জালপনায়, বন্ধুত্বে, বিশ্বাসঘাতকতায় সামাজিক বোধে, মানুষের চৈতন্যে নির্জলা অঞ্চল জন্মায়– যা কখনও কখনও প্যারাবলের আকারে সূত্রাবদ্ধ হয়।

মন বলে, বাঙলায় কবিতা ও কথাসাহিত্যের মধ্যবর্তী একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে প্যারাবল, কী হতে পারে কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের একান্নবর্তী টোলসূত্র; হয়তো তা বয়ান করবে আমাদের হারিয়ে যাওয়া মহাকাব্যের স্মৃতি ও দর্শন। প্যারাবল গতকাল ও আগামীকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস– আজ এখানে উপস্থিত নেই, আজ কেবল তার রন্ধনশালাটি আছে।

রসুইঘরে হয়তো তৈল সংকট আছে, কিন্তু নিয়ত গুণে বরকত হবে– এই আশায় একটি প্যারাবল রান্না করা হোক।

নয়া ঘড়া কানা কলস।। বাগানের বয়েসী মালী বেশ কতোকটা দূরের নদী থেকে জল তুলে পাট্টায় বাগানে নিয়ে আসে। ফুলগাছের গোড়ায় গোড়ায় জল ঢেলে দেয়– গাছেরা কলবলিয়ে ডাঙ্গর হয়ে ওঠে, গাছে গাছে নাকফুল, কানের দুল ফুলমঞ্জরি দোলে।

মালীর দুই জলতোলা গাগরীর মধ্যে একখান অতি পুরনো– এখানে ওখানে চিলতা উঠে গ্যাছে। অনেকগুলো ফুটো হয়ে আছে বলে পথে পথে পানি পড়ে যায়, বাগানে এসে পৌঁছার পর কানা কলসিতে জল প্রায় থাকেই না।

নিজের অকেজো ভাঙাচোরা দশা দেখে ফুটো কলস মালীকে বলে, আমাকে বরং ফেলে দাও ভাই, আমি তোমার দরকারি জল ধরে রাখতে পারি না।

মালী কেমন ভূতগ্রস্ততায় বলে, তার আগে চলো তোমাকে একটা জিনিস দেখিয়ে আনি। যেই কথা সেই কাজ, যে-পথে মালী প্রতিদিন জল বয়ে আনে, সেই পথে ভাঙা কলসীকে নিয়ে যায় মালী।

মালী বলে, দেখো পথের পাশে কত বুনো ফুল ফুটে আছে। তাই তো দেখছি। এ তোমারই কীর্তি! এই পথে জল নিয়ে যাবার সময় তোমার ছিদ্র দিয়ে রাস্তার ধারে জল গড়িয়ে পড়ে, তার ফলে এমন এক বেহেস্তি বাগান গড়ে ওঠে।

তোমার শরীর ভেঙে পড়েছে–কিন্তু তুমিই বানিয়েছো কী আচানক ফুল বাগিচা!

পাউলো কোয়েলহো : নয়া ঘড়া কানা কলস।

আলাপী মুসলমান কূলে জন্ম নেওয়া কললড়া মেয়ে– তার একমাত্র ছেলে ১৫ বছরের আব্দুস সোবান গঞ্জে গিয়েছিল রোজগার পাতি করতে, মাস যায়– বছর গড়ায় সোবান যে আর আসে না। সোবানের মা ট্রেনের দিকে চেয়ে চেয়ে বিলাপ করে– সোবান, ও আমার নিমাই, নিমাই গো।

প্যারাবলের শ্রুতি অশ্রুতির ভিতর ধস ও আগুনের বাগান বাড়ি এসে পৌঁছালেই আমরা দেখতে পাই:

এমন অনেক আগুন আছে– ফুঁ দিলে নেভে– কোন কোন আগুন ফুঁ দিলে জ্বলে!

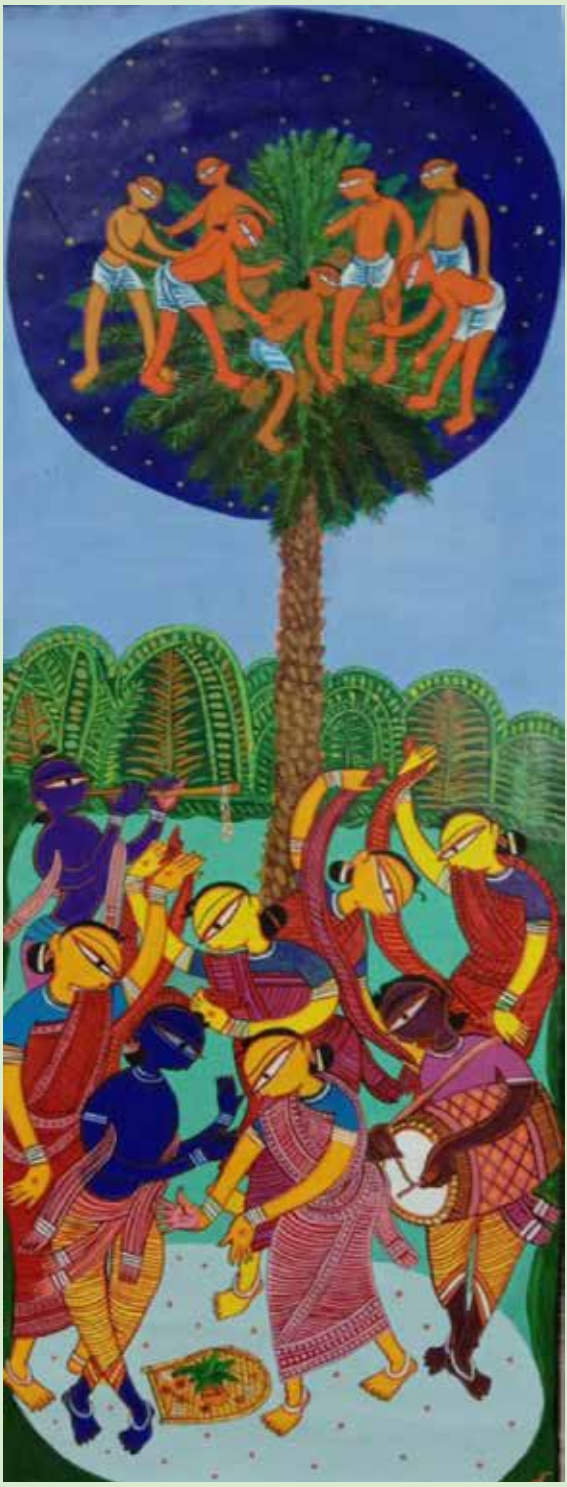

‘খেজুর সন্যাসী’
নিখিল চন্দ্র দাস
মাধ্যম: এক্রিলিক রং

ভাষান্তরিত প্যারাবল

ফ্রানৎস কাফকা
ভাষান্তর: নিশাত শারমিন শান্তা

একটি রাজকীয় চিঠি

মহারাজ আপনার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। রাজরাজড়ারা যেমন পত্রজারি করে থাকেন, সরকারি লেফাফায় সিলগালা করা আদেশনামা– সেরকম অবশ্য নয়। বরঞ্চ চিঠির বিষয় ও পরিবেশনা এতটাই স্পর্শকাতর, যেন মনে হয়, রাজকীয় প্রতাপ থেকে অনেক দূরে জবুথবু এক আপাততুচ্ছ ছায়া হয়ে সে লুকোতে পারলে বাঁচে।

তেমনই এক কাতর চিঠি মহারাজ তাঁর মৃত্যুর পরে শুধু আপনার ঠিকানাতেই পৌঁছাতে বলেছেন।

চিঠি নিয়ে যার যাওয়ার কথা, সেই বার্তাবাহক এসে দাঁড়ালো মাথা নীচু করে। মহারাজের মৃত্যুশয্যা পাশে। তিনি চোখের ইশারায় তাকে নতজানু হয়ে বসতে বললেন। তারপর কানে কানে ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন চিঠির বার্তা। সেটার নির্ভুলতার ব্যাপারে তাঁকে এতটাই উদ্বিগ্ন মনে হলো যে, দেখা গেল, বাহককে তেমনি ফিসফিস করেই সেটা তাঁকে আবার শোনানোর নির্দেশ দিলেন। শোনার পর মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে জানালেন, তিনি সন্তুষ্ট।

হ্যাঁ....তাঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বাইরে জড়ো হওয়া অগণ্য প্রজাকূল, সাম্রাজ্যের মহান রাজকুমার, অমর্ত্যবর্গ আর তাদের লাখো হাজারো উৎসুক চোখ আর কানকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে মহারাজ আপনার জন্য তাঁর গোপনবার্তাটি রওনা করিয়ে দিলেন।

বার্তাবাহক বিন্দুমাত্র দেরি না করে দৌড় লাগালো আপনারই গৃহের উদ্দেশে।

শক্তিশালী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন মানুষ; প্রবল ভিড়ের মধ্য দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে দ্রুত কনুই চালিয়ে সে পথ করে নিচ্ছে। বাধা পেলে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে নিজের বুকের পানে, যেখানে জ্বলজ্বল করছে রাজকীয় সূর্যপ্রতীক।

এই ঠেলেঠুলে পথ করে নেওয়াটা মুখে বলা যতটা সহজ, আদতে তা নয়। বস্তুত

ফ্রানৎস কাফকা
ভাষান্তর: নিশাত শারমিন শান্ত
একটি রাজকীয় চিঠি

প্রাসাদে আজ যেন অন্তহীন এক জনসমুদ্র, যার তীর দৃষ্টির অগোচরে।

অবশ্য বার্তাবাহক ডানায় ভর করে উড়ে গিয়েও সেই জনসমুদ্র পার হতে পারতো যদি.... আপনার কানে বাজতো, বেলাভূমি উজিয়ে....উঁচুনীচু পথ পেরিয়ে.... তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে তার ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসা পদশব্দ.....আর আপনার মনে হতো, 'এই তো!! আর একটুখানি পথ!! এক্ষুণি দরজায় বাজবে করাঘাত আর শোনা যাবে একটা তীক্ষ্ণ হাঁক..... চিঠিইইইইইইই..... '

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আশায় গুড়ে বালি।

এই সুদীর্ঘ পথ ফুরোতেই চায় না..... ফুরোতে চায়ই না।

ক্লান্তিতে নুয়ে আসলেও সে বার্তাবাহক হয়তো দেখবে, প্রাসাদের বিশাল ঘরগুলোই এখনো শেষ হয় নি; কিংবা সেগুলো পেরিয়ে এলেও সিঁড়ির নিচে ওঁৎ পেতে রইবে দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া পথ; এবং সেই পথকেও যদি ছোটার লড়াইয়ে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়,তবে লাভ হবে না তেমন কিছুই।

বিশাল দরবারগুলো তো রয়েই গেছে... তার পরে দ্বিতীয় মহল .... আরও একবার সোপানশেণী .... আরো এক দরবার ..... এবং তৃতীয় মহল .... চতুর্থ... পঞ্চম....

আরো.....আরো.....

হাজার বছর ধরে.....।

এবং যদি শেষ পর্যন্ত শেষ সিংহদুয়ারটা খুলেও যায় সশব্দে.....এই অনন্ত যাত্রা তবুও শেষ হবে না। সামনে আদিগন্ত সুবিশাল রাজধানী, এক পৃথিবী জটিলতা নিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে বার্তাবাহকের দিকে..... ঠা ঠা করে হাসছে ঠাস বুনোটের ক্রুর হাসি। কেউই সেই জটিলতার অরণ্যে পথ খুঁজে পায় না..... আর তেমন কোনো ক্লান্তপ্রাণ তো কখনোই নয়, যার বুকের খামে ঘুমিয়ে আছে কোন এক মৃত জনের অজানা কথকতা ..... শুধুমাত্র আপনারই জন্য।

তারপরও প্রতি সন্ধ্যায় জানালার পাশে ছায়া ছায়া আঁধারে বসে আপনি বুনে চলবেন ক্লান্তিহীন স্বপ্নজাল.....

চিঠি আসছে..... রাজার চিঠি....

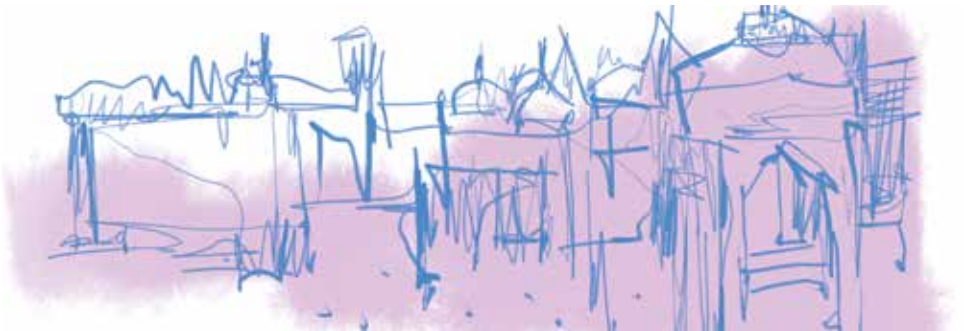

ফ্রানৎস কাফকা
ভাষান্তর: নওশিন ইয়াসমিন

একটি প্রাচীর গড়ার সমাচার– একটি ভাঙন

একটি দীর্ঘ দেয়াল তৈরি হবে। এ সম্পর্কে এখন অনেকেই কম বেশি অবগত। কিন্তু প্রথম যেদিন সম্রাটের এ বার্তা আমাদের কানে পৌঁছুলো সেদিন ছিলো আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগের এক উষ্ণঋতুর সন্ধ্যে। মাত্র কদিন আগেই মাঠের ধানকাটা শেষ হয়েছে। এবারে ফলন বেশ ভালো, নদীর পাড় তাই এখন ধানের হাট আর চারিদিকে তারই সোঁদা গন্ধ।

সেদিন দশ বছর বয়সী আমি, বাবার সাথে ইয়াংজি নদীর পাড়ে বাসায় ফেরার জন্য নৌকার অপেক্ষা করছিলাম। বাবা তার একহাতে আমার হাত ধরেছিলো, যদিও পথ আমার চেনা তবুও আমার বাবা পুত্রের হাত তার হাতের মাঝে রাখতেই বেশি পছন্দ করতো কি না! আর তার অন্য হাতে ঠিক বাঁশি ধরার ভঙ্গিতে একটি তামাকের পাইপ। গ্রীষ্মের মৃদু শীতল বাতাসে তার গালের কাঁচাপাকা দাঁড়িগুলো উড়ছিলো আর সে কমলা সূর্যের দিকে তাকিয়ে পাইপে টান দিয়ে সাদাটে ধোঁয়ার রিং বাতাসে ছুঁড়ে উপহার দিচ্ছিলো। ধোঁয়ার শেষগুলো তার সোনার সুতোয় বোনা রেশমের পোশাকের বিরুদ্ধে নরম ঝাঁকুনিতে ঝরে ঝরে পড়ছিল। এটি তার ব্যক্তিগত চাকর তৈরি করে দিয়েছিলো। খানিকবাদে একটি ছোট নৌকা আমাদের সামনে এসে থামল; আমরা নৌকায় উঠতেই মাঝি বাবার সাথে গল্প জুড়ে দিলেন। সারাদিনের লোক পারাপার, ধানের দর, ইত্যাদি গল্প করতে করতে নৌকাওয়ালা বাবার দিকে কিছু একটা ইশারা করলেন। বাবা তার কাছে যেতেই কানে ফিসফিসিয়ে কিছু বললেন যা শুনে বাবার আনন্দপূর্ণ চেহারা মুহূর্তেই কালোমেঘে ছেয়ে গেলো। চোয়াল শক্ত করে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মাঝির দিকে তাকিয়ে ও মুখ ফিরিয়ে নিলো। নৌকার মাঝি আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে তার বুকের দিকে ইশারা করলেন যেখানে আঁকা ছিলো একটি রাজকীয় সূর্য। তিনি বারেবারে বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে এটি সত্য। কিন্তু বাবা পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে রইলো, আর নৌকাচালক হাত ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে তালি দিয়ে আবার বৈঠা বাইতে শুরু করলেন। ধ্যানমগ্নভাবে বাবা আমার দিকে ফিরে হাতের পাইপটি ছুঁড়ে ফেলে আমাকে তার কোলের কাছে টেনে নিলো। তার শক্তমাটির দলার মতো হাত পরম মমতায় আমার পাট করে বাঁধা চুল ভেঙে এলোমেলো করে দিলো।

ফ্রানৎস কাফকা
ভাষান্তর: নওশিন ইয়াসমিন

একটি প্রাচীর গড়ার সমাচার– একটি ভাঙন

সূর্যকে নদীতে ঘুম পাড়িয়ে আমরা নৌকা থেকে নামলাম। ঘরে পা দিতেই খাবার টেবিলের রাইস স্যুপের গন্ধ... পেটের খিদের বেড়াল ম্যাঁও ম্যাঁও। টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি বাবার বন্ধুরা এসেছেন। কিন্তু বাবার যেনো এসব দিকে কোনো আগ্রহ নেই। সে আমাদের বাড়ির দারোয়ানটির সাথে গম্ভীরভাবে কী যেনো আলাপ করছিলো... কী বলছিলো তা এখন আর মনে করতে পারিনা। অবশ্য এইতো স্বাভাবিক। স্মৃতি তো কিছু হারায়ই সময়ের জলে।

তবে পরিস্থিতির কারণে অথবা অসাধারণ গম্ভীর পরিবেশের কারণ আমিও এর কারণ জানতে আগ্রহী হয়েছিলাম। বাবার বন্ধুরা অনেকে বলছিলেন "কী অদ্ভুত মাঝি! আগে তো এমনটা দেখিনি।" একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে বললেন,"সম্রাটকে রক্ষা করার জন্য একটি দুর্দান্ত প্রাচীর নির্মিত হতে চলেছে।" কর্তব্য নিশ্চিত জেনেও আরও অনেক প্রশ্ন ছিলো।

তাদের একজন বললেন, "আমরা দক্ষিণের বাসিন্দারা তো আমাদের মতোই থাকি।"

তাকে সমর্থন জানিয়ে অন্যজন বললেন, "হ্যাঁ... আমাদের মধ্যে অনেকের ভাষার তারতম্য আছে তবু এই ভূমিতেই আমরা এতোবছর সুখে আছি, উত্তরের লোকদের থেকে আমাদের কি ভয়?"

–"এতোদিন অব্দি তো কোনো অনিষ্ট হলো না। তবে কেনো?"

মা অবশ্য রাতে ঘুমোতে দেরি করলে আমাকে হানাদারদের গল্প শোনাতেন। সেই যে কালো পোশাকে রাতের আঁধারের মাঝে মিশে লুকিয়ে আসে, কাঁধে কালো তীরের তূণ,তীরের ডগায় বিষ। অসুরক্ষিত সম্পদ লুটপাটই তাদের জীবিকা। তবে তারা কি সত্যিই এলো?

তাদের থেকে বাঁচতেই বুঝি সম্রাট আদেশ দিয়েছেন কৃষক, মাঝি সবাইকে কাজ ফেলে সুরক্ষা পাচীর তৈরির কাজে যোগ দিতে হবে,নয়তো দণ্ড। সম্রাটের আদেশ অমান্য... ... তবে তো বিদ্রোহের দণ্ড! তাইতো বাবাও পরদিন রাতে চলে গেছিলো কাজে যোগ দিতে... আজ আমার পালা। বুকে রাজপ্রতীক আঁকা দূতের হাতে চিঠি এসে পৌঁছেছে... নিত্যদিনের কাজের জাল গুটিয়ে সুরক্ষা কাজে যোগ দেবার।

সম্রাটও কি ছোটবেলায় রূপকথার সেই হানাদারদের গল্প শুনেছিলেন?

ফ্রানৎস কাফকা

অনুবাদ: রুবাইয়াত রিক্তা

প্রহরী

আমি দৌড়ে প্রথম প্রহরীকে পেরিয়ে গেলাম। তারপরে আমি আতঙ্কিত হয়ে ফিরে এসে প্রহরীকে বললাম: 'আপনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার সময় আমি এখান দিয়ে দৌড়ে গেছি।' প্রহরী তাকিয়ে রইলো কিছুই বললো না। আমি বললাম,'আমার কাজটি করা ঠিক হয়নি।' প্রহরী এরপরও কিছু বললো না। 'আপনার নীরবতা কি তাহলে অতিক্রম করে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়?'...

মশীহ'র আগমন

বিশ্বাসের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ যখন সবচেয়ে বেশি অবারিত হবে তখন মসীহ'র আগমন তরান্বিত হবে-যখন এই সম্ভাবনাটি ধ্বংস করার মতো কেউ থাকবে না এবং এই ধ্বংসের জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না; তখন কবরগুলো নিজেরাই খুলে যাবে। এটি সম্ভবত খ্রিস্টান মতবাদ- যা উদাহরন হিসেবে যতবার সম্ভব উপস্থাপন করা হয়েছে। যা একটি স্বতন্ত্র উদাহরন, যা একক ব্যক্তির পুনরুত্থানের প্রতীকী উদাহারণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মশীহ তখন আসবেন যখন তাঁর আর বেশিদিন প্রয়োজন হবে না; তার আগমনের পরের দিন কেবল তিনি আসবেন; তিনি আসবেন, শেষ দিনে নয়, কিন্তু একদম শেষে..।

ভাষান্তরিত প্যারাবল

হোর্হে লুইস বোর্হেস

ভাষান্তর: মাজহার জীবন

কিংবদন্তী

হাবিল মারা গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর কাবিলের সাথে সাক্ষাৎ। দু'জন একটা মরুভূমির মাঝ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দু'জনই অনেক লম্বা হওয়ায় দূর থেকে তারা পরস্পরকে চিনতে পারলো। দু'ভাই মিলে মাটিতে বসলো। আগুন ধরালো তারা। তারপর খাওয়া দাওয়া করলো। গোধূলীলগ্ন শুরু হলে বিষন্ন মানুষ যা করে তেমনভাবে দু'ভাই নীরবে বসে রইলো। তখন আকাশে একটা তারা মিটমিট করে জ্বলে উঠলো। যদিও তখনো তারাটার নাম দেয়া হয়নি। আগুনের আভায় কাবিল হাবিলের কপালে পাথরের আঘাতের দাগটা দেখতে পেলো। দাগ দেখে মুখে দিতে যাওয়া রুটি কাবিলের হাত থেকে পড়ে গেল। তাকে ক্ষমা করার জন্য ভাইকে বলল।

"তুমিই কি আমাকে হত্যা করেছ? নাকি আমি তোমাকে হত্যা করেছি?" হাবিল উত্তরে বললো, "আমার এখন আর মনে নাই। আমরা দু'জন এখন একসাথে। আগের মতই।"

"এখন বুঝতে পারছি সত্যিই তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।" কাবিল বলল, "কারণ ভুলে যাওয়াই ক্ষমা করা। আমিও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবো।"

"ঠিকই" হাবিল আস্তে বলল, " যতক্ষণ পর্যন্ত অনুশোচনা আর অপরাধবোধ থাকে।"

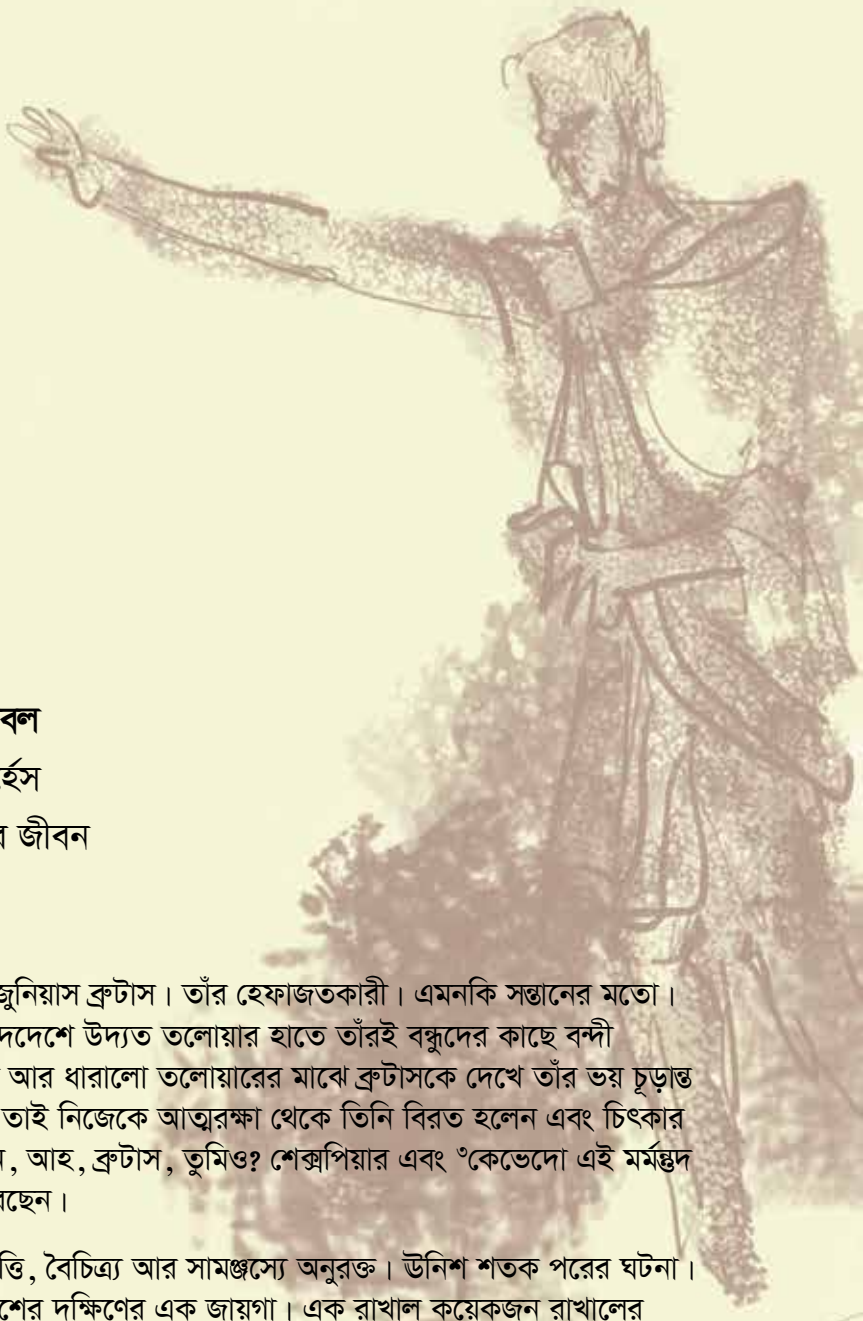

ভাষান্তরিত প্যারাবল

হোর্হে লুইস বোর্হেস

ভাষান্তর: মাজহার জীবন

প্লট

[১]সিজার। [২]মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাস। তাঁর হেফাজতকারী। এমনকি সন্তানের মতো। একটা ভাস্কর্যের পাদদেশে উদ্যত তলোয়ার হাতে তাঁরই বন্ধুদের কাছে বন্দী সিজার। সেসব মুখ আর ধারালো তলোয়ারের মাঝে ব্রুটাসকে দেখে তাঁর ভয় চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছালো। তাই নিজেকে আত্মরক্ষা থেকে তিনি বিরত হলেন এবং চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, আহ, ব্রুটাস, তুমিও? শেক্সপিয়ার এবং [৩]কেভেদো এই মর্মন্তুদ কান্না লিপিবদ্ধ করেছেন।

ভাগ্য হলো পুনরাবৃত্তি, বৈচিত্র্য আর সামঞ্জস্যে অনুরক্ত। উনিশ শতক পরের ঘটনা। বুয়েন্স আয়ার্স প্রদেশের দক্ষিণের এক জায়গা। এক রাখাল কয়েকজন রাখালের আক্রমণের শিকার হলেন। তিনি মাটিতে পড়ে গিয়ে তাঁর নিজ ধর্মপুত্রকে দেখতে পেলেন। সামান্য বিস্ময় আর হালকা প্রতিবাদ করে তাকে বললেন (এ শব্দগুলো কেবল শোনার জন্য বলার জন্য না): কিন্তু! বালক! উহ। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তিনি মারা যাচ্ছেন আর আরেকটা দৃশ্য আবারও মঞ্চস্থ হতে পারে।

---

[১]জুলিয়াস সিজার (১০০- ৪৪খৃ. পূর্ব) রোমান জেনারেল এবং রাজনীতিবিদ

[২] মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাস (৮৫-৪২ খৃ. পূর্ব), রোমান সিনেটর এবং জুলিয়াস সিজারের হত্যার সাথে জড়িত থাকার কারণে আলোচিত।

[৩]ফ্রান্সিসকো গোমেজ দে কেভেদো (১৫৮০- ১৬৪৫) স্পেনের একজন রাজনীতিবিদ, লেখক ও কবি।

ভাষান্তরিত প্যারাবল

হোর্হে লুইস বোর্হেস

ভাষান্তর: মাজহার জীবন

সমস্যা

আসুন আমরা কল্পনা করি, আরবী হরফে লেখা একটা কাগজ [৪]টলেডোতে আবিষ্কার হলো। প্রাচীন হস্তলিপিবিদ জানালো এটি সিদে হেমেতে [৫]বেনেনজেলি'র লেখা, যে উৎস থেকে সার্ভান্তেস তাঁর [৬]*ডন কিহোতে* লিখেছেন। কাগজটা থেকে আমরা জানলাম, নায়ক (আমরা সবাই জানি, স্পেনের রাস্তায় রাস্তায় তলোয়ার আর বল্লম হাতে কারণে-অকারণে নায়ক যে কাউকে চ্যালেঞ্জ জানায় আর ঘুরে বেড়ায়) বুঝতে পারলো এক মারামারিতে সে একজনকে হত্যা করে ফেলেছে। এ রকম এক জায়গায় কাগজটি ছিঁড়ে গেছে। এখন সমস্যা হলো, এমতাবস্থায় ডন কিহোতের কি প্রতিক্রিয়া হলো তা ধারণা করা বা অনুমান করা।

এ বিষয়ে তিনটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি। প্রথমটা নেতিবাচক: তেমন বিশেষ কিছু ঘটেনি। কারণ ডন কিহোতের অলীক জগতে মৃত্যু যাদুর মতই অস্বাভাবিক কিছু না। আর ঠিক এ জন্যই, যে যুদ্ধ করে তার কাছে সামান্য এক মানুষ হত্যা কোনরকম বিরক্তির কারণ হতে পারে না। এমনকি সে ভাবতেই পারে, এ কোন তুচ্ছ জীব বা জাদুকরের সাথে যুদ্ধ।
দ্বিতীয়টা মর্মান্তিক: ডন কিহোতে কোনভাবেই ভুলতে পারেনি যে, সে কল্পকাহিনির আলোনসো [৭]কুইজানো'র প্রতিরূপ ও তারই বহি:প্রকাশ। মৃত্যু দৃশ্য দেখে সে বুঝতে পারে যে একটা বিভ্রম তাকে কাবিলের মতো পাপ করতে প্রলুব্ধ করেছে। এর ফলে সে তার ইচ্ছাকৃত পাগলামো থেকে সম্ভবত চিরদিনের জন্য বের হয়ে আসে।
তৃতীয়টা সম্ভবত সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য: লোকটাকে হত্যার পর ডন কিহোতে এ ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি যে, এই ভয়ঙ্কর ঘটনা নিছক প্রবল একটা মানসিক উত্তেজনার ফল ছিল। বাস্তবতার ফল তাকে বাস্তবতার কারণ সম্পর্কে ধারনা করতে শিখিয়েছে। আর ডন কিহোতে কখনোই তার এই পাগলামো থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি।

তবে আরেকটা হাইপোথিসিস হলো, যা স্পেনীয়দের মনোস্তত্ত্বের কাছে অপরিচিত (পশ্চিমা মনোস্তত্ত্বের কাছেও) যার জন্য প্রয়োজন আরো প্রাচীন, আরো জটিল এবং আরো কালজীর্ণ পরিবেশ। তখন ডন কিহোতে আর ডন কিহোতে নাই বরং হিন্দুস্থান কালচক্রের একজন রাজা। সে তার শত্রুর শরীরের উপর দাঁড়িয়ে আছে যেন হত্যা আর বিপন্নতা ঈশ্বরের কিংবা যাদুর ব্যাপার। কিন্তু সবাই জানে সেটা মানুষের লোকোত্তর অবস্থা। সে জানতো মৃত্যু হলো মায়া। যেমনটি হাতে তার উদ্যত রক্তাক্ত তলোয়ার, সে নিজে, তার পুরো অতীত জীবন, শত শত দেবদেবী আর মহাজগতও মায়া।
বাংলা অনুবাদ এন্ড্রু হার্লির স্পেনিশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা হয়েছে।

[৪]স্পেনের একটি শহর এবং টলেডো প্রদেশের রাজধানী

[৫]*ডন কিহোতে* উপন্যাসের একজন আরব মুসলিম ঐতিহাসিক

[৬] *ডন কিহোতে* মিগুয়েল দি সার্ভান্তেসের লেখা উপন্যাস যা ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়

[৭]ডন কিহোতে উন্মাদ হয়ে গেলে তার নাম হয় আলোনসো কুইজানো

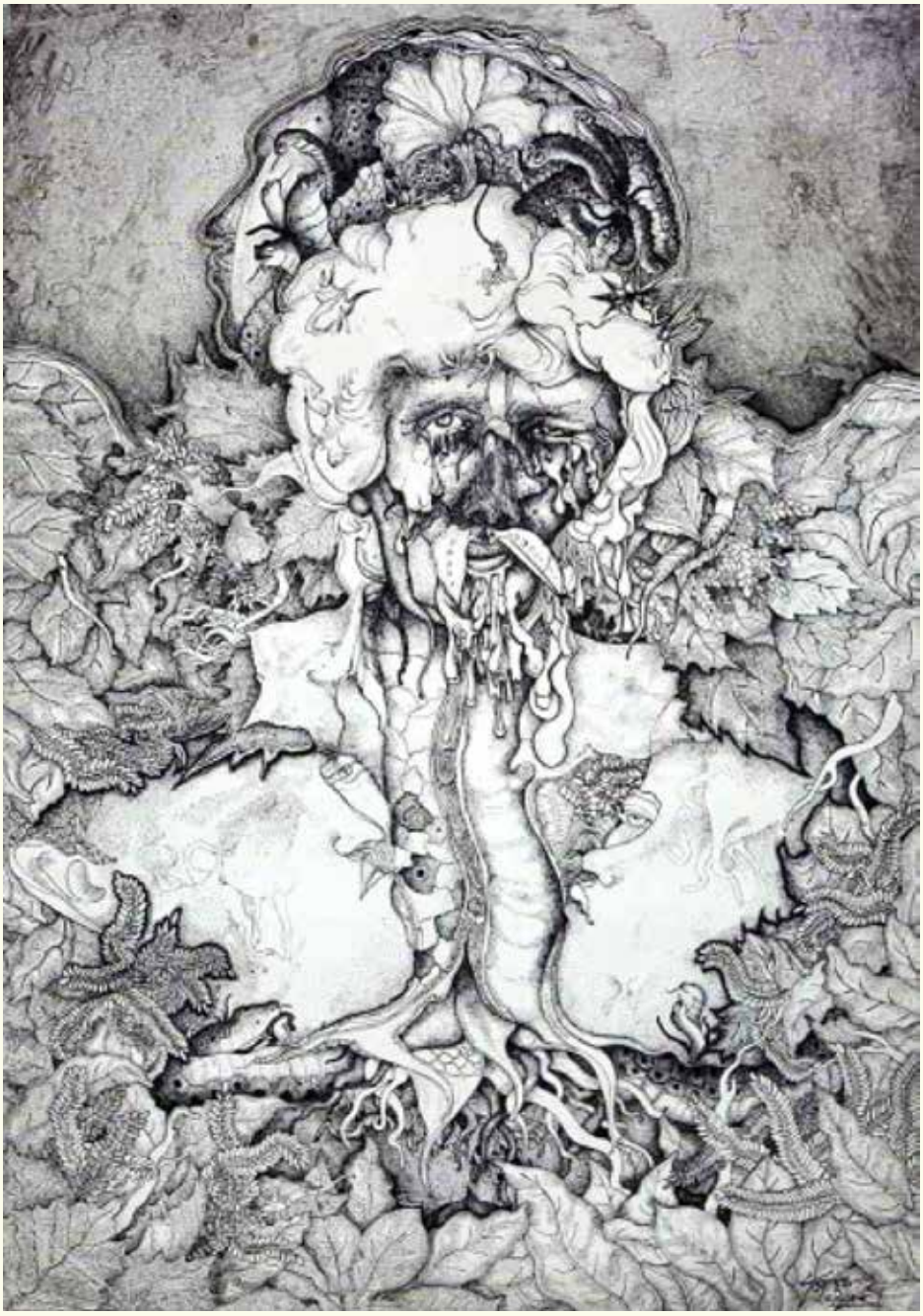

‘পর্যায় জীবন-৪’
কাদের ভূঁইয়া
মাধ্যম: কালি ও কলম

চরিত

বেনজামিন রিয়াজী

সৎকার

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভিড়ে মিশে ছিল আমাদের চোখ।
নির্বিকার লালসার রসনায় পবিত্র পাবক,
ভস্মীভূত করেছিল চিতাকাঠে শুয়ে থাকা দেহ;
আমাদের মন থেকে মুছে দিয়ে সকল সন্দেহ।

চারিদিকে অন্ধকারে জমেছিল আরো কত কিছু,
চেনা শবযাত্রী ছাড়া অচেনারা নিয়েছিল পিছু---
সময়ের স্রোত ভেঙ্গে আদি আর অন্ত থেকে আসা,
মগজের তেপান্তরে গুঞ্জরিত শব্দহীন ভাষা,

বিচিত্র বিস্মৃত ছবি পুড়ে যাওয়া ধূম্রজাল স্মৃতি,
জীবনের কোলাহল জীবনের সঞ্চিত নিভৃতি,
আগুনে আগুন পোড়ে, পুড়ে যায় জলে ধোয়া জল,
পোড়ানো বাতাসে ওড়ে ছাই হওয়া মানুষের দল।

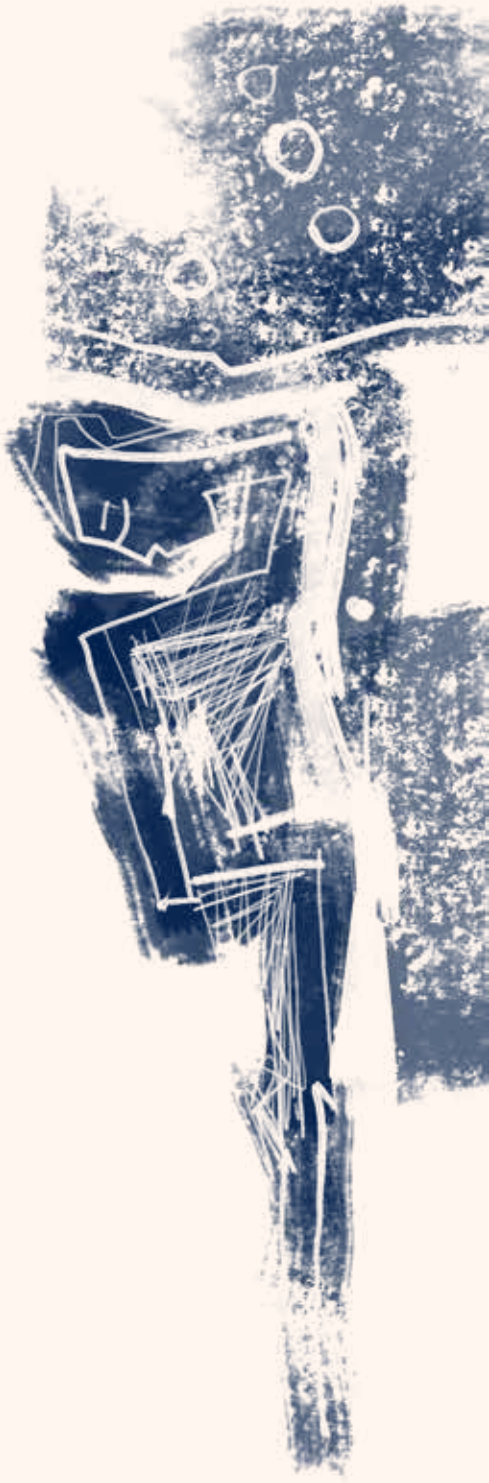

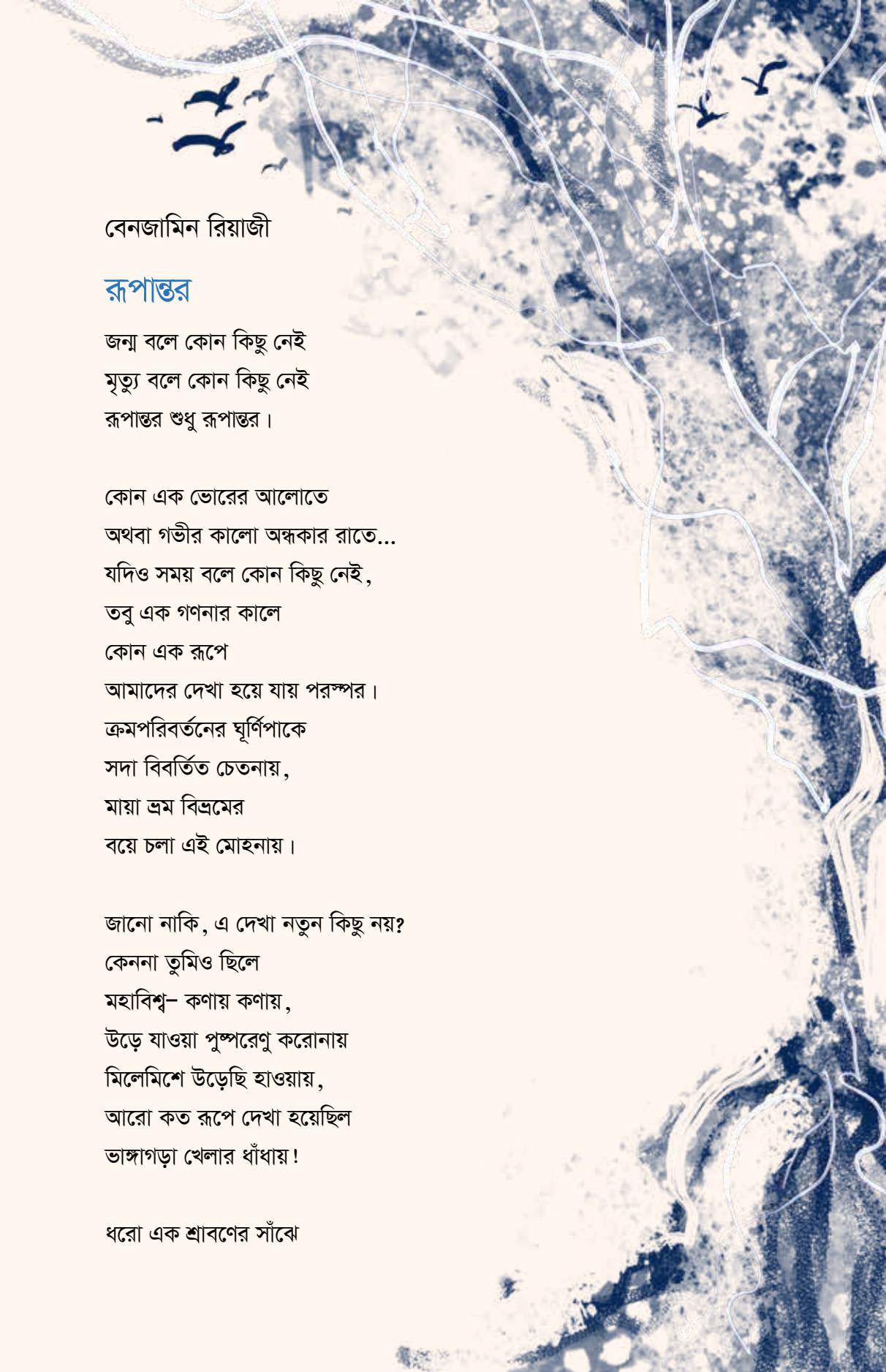

বেনজামিন রিয়াজী

রূপান্তর

জন্ম বলে কোন কিছু নেই
মৃত্যু বলে কোন কিছু নেই
রূপান্তর শুধু রূপান্তর।

কোন এক ভোরের আলোতে
অথবা গভীর কালো অন্ধকার রাতে...
যদিও সময় বলে কোন কিছু নেই,
তবু এক গণনার কালে
কোন এক রূপে
আমাদের দেখা হয়ে যায় পরস্পর।
ক্রমপরিবর্তনের ঘূর্ণিপাকে
সদা বিবর্তিত চেতনায়,
মায়া ভ্রম বিভ্রমের
বয়ে চলা এই মোহনায়।

জানো নাকি, এ দেখা নতুন কিছু নয়?
কেননা তুমিও ছিলে
মহাবিশ্ব– কণায় কণায়,
উড়ে যাওয়া পুষ্পরেণু করোনায়
মিলেমিশে উড়েছি হাওয়ায়,
আরো কত রূপে দেখা হয়েছিল
ভাঙ্গাগড়া খেলার ধাঁধায়!

ধরো এক শ্রাবণের সাঁঝে

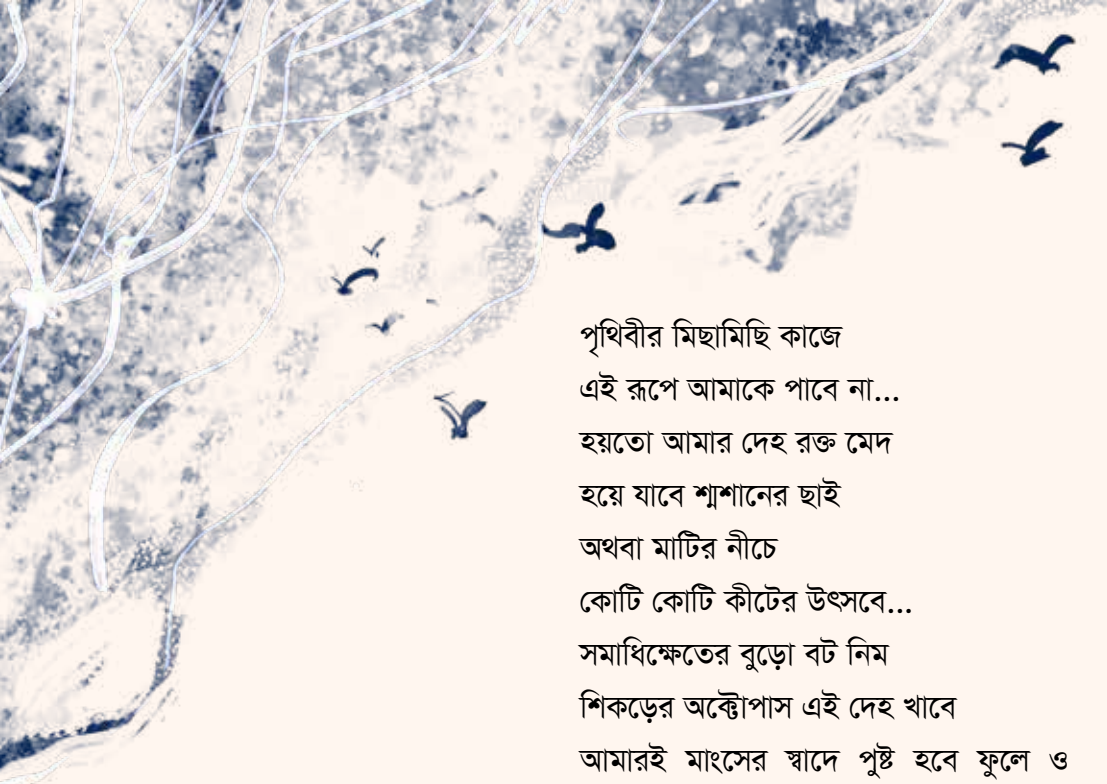

পৃথিবীর মিছামিছি কাজে
এই রূপে আমাকে পাবে না...
হয়তো আমার দেহ রক্ত মেদ
হয়ে যাবে শ্মশানের ছাই
অথবা মাটির নীচে
কোটি কোটি কীটের উৎসবে...
সমাধিক্ষেতের বুড়ো বট নিম
শিকড়ের অক্টোপাস এই দেহ খাবে
আমারই মাংসের স্বাদে পুষ্ট হবে ফুলে ও পাতায়

নিমফল ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাবে
বৃত্তাহারী পাখি...
আমিও তাদের সাথে উড়ে যাবো,
তাদের উদোর হতে উদগারিত বীজ হতে
পুনরায় অংকুরিত হবো...
নিম হবো বট হবো; রাধাচূড়া জারুলের ফুলে
এইসব রূপান্তরে দেখা হবে আবার আবার
শিমুলের অন্তহীন লালে।

বেনজামিন রিয়াজী

প্রজাপতি

একটি প্রজাপতি ঝলসে গেল মোমের আগুনে।
বর্ণিল কারুময় সুন্দর পাখাদুটি
ছাই হয়ে যাবার পরেও
দীর্ঘক্ষণ চেয়ে ছিল সে ঐ আগুনেরই দিকে,
তারপর রূপান্তর পেল
আরো বেশী স্তব্ধতার সারাৎসারে
ক্রমশই মাটি হয়ে গেল–
মাটির ভেতরে তার ঘুম ।

তবু যারা অগ্নি জ্বেলেছিল
দূরের পাহাড় থেকে বয়ে এনে বজ্রের আকর
অথবা অরণী ঘসে, শিলার লাঙল চষে
প্রান্তরে ফুটিয়েছিল আগুনের মতো রাঙা ফুল;
হোমো-ইরেক্টাস সেই আমাদেরই আদি পিতামাতা।
তাদেরই সন্তান আমি। তুমিও হে পতঙ্গ-দুহিতা
মাটি থেকে উৎসারিত আমারই মতোন,
বনাগ্নির বহ্নুৎসবে জড়ো হওয়া হে আমার প্রিয়তমা বোন–

আমিও পুড়েছি কত শতাব্দীর দহনের আঁচে,
আমাদের ঝলসানো মাংস খেয়ে বেড়ে ওঠা
আমাদেরই প্রজন্ম প্রজাতি – পিতৃমাংস জ্বলে তার দেহে,
তোমারই পাখার রঙ ঝলে তার দেহে,
হে আমার পুষ্পপারিজাতরাঙা হৃদয়ের রক্তপ্রজাপতি।

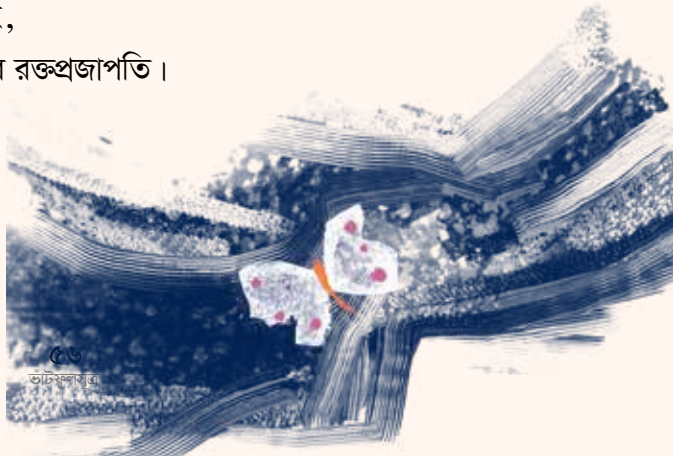

বেনজামিন রিয়াজী

শিকার

আমি কি ছেড়েই দেবো হাল?
ডিঙ্গিটাকে ভেসে যেতে দেবো ঘোলা স্রোতে?
গুটিয়ে নিচ্ছি যেই জাল
নেই জেনে মাছের কম্পন
ছেড়ে দিয়ে রশি
পাটাতনে মুখ ঢেকে বসি;
ঊর্ধ্বচোখে খুঁজে দেখি কোথায় ঈশ্বর --
নীলিমা শুধুই বালুচর,
উজানে বেঁধেছি যেই ঘর
মিশে গেছে ধোঁয়াটে রেখায়।

আসলে উজান-ভাটি নেই।
ভাটিও উজান হয়ে যায়,
শিকারি জালের জেলে
মাছেদের খাদ্য হয়ে যায়
ভরা পূর্ণিমায়
আমি ভাবি
ছেড়ে দিয়ে হাল
ছুটে আসা স্রোতে বেসামাল
ডিঙ্গিটার সাথে আমি নাচি --

অরূপ অদৃশ্য জাল ফেলে
আমাকে শিকার করে নিয়ে যাক
রুদ্র মহাকাল।

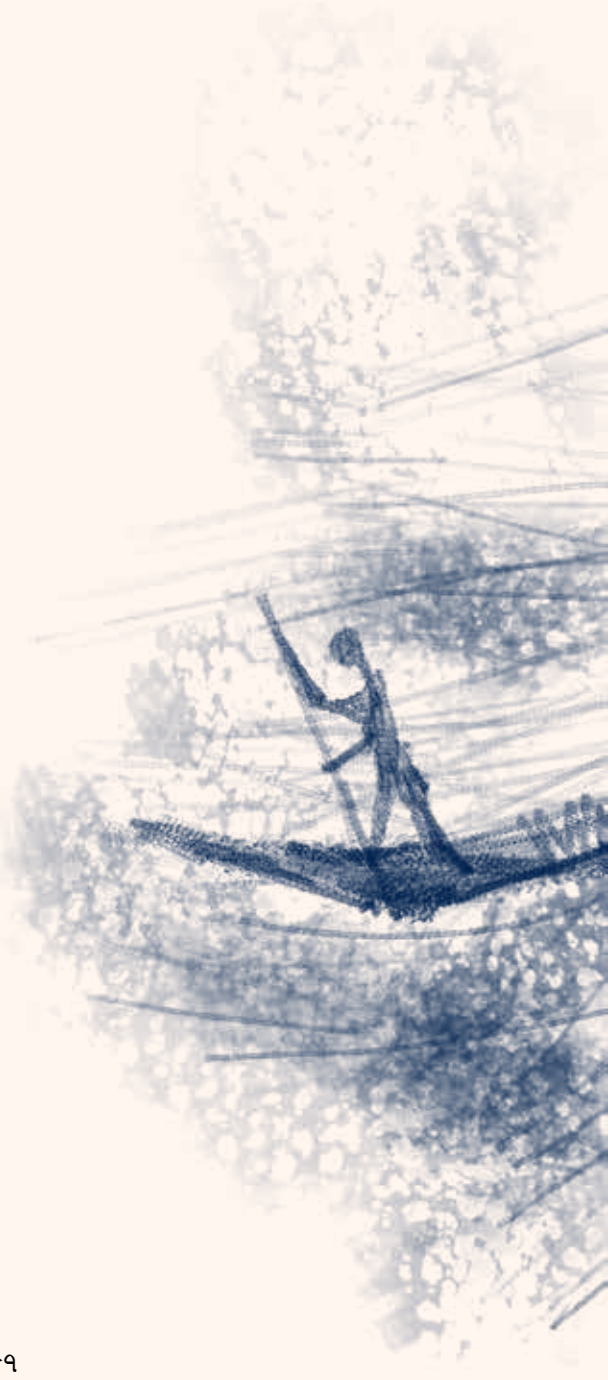

বেনজামিন রিয়াজী

আবারো একটি দিনের মৃত্যু হলো

আবারো একটি দিনের মৃত্যু হলো

রাত্রির কালো কাফনে মোড়ানো লাশে

কবরে শোয়ানো শীতল শরীর ঘিরে

সময়ের পোকা মেতেছে ভোজোল্লাসে।

জেগেছে কি বোধ আমাদের অনুভবে!

আমার অজানা, তুমি কি বুঝতে পারো?

শব্দহীনতা নাকি জোর কলরব?

দৃশ্যের পটে আঁকা আছে কোন ছবি,

অথবা কুয়াশা মুছে দিয়ে গেছে সব?

লালন নূর

আনন্দ-রুমাল

চলে গেলে ফিরে আসা বলে কিছু কথা থাকে চার দেয়ালের সাদা ছবিটার উপরে ও নিচে; চলে না গেলে তো ফিরে আসা বলে আর কিছু নাই! তাই মানুষেরা যায় না কোথাও, যাওয়ার কথা ভেবে ভেবে শুধুই অপেক্ষা করে – যদি কোন ভোরে উড্ডীন পাখির ঝরে পরা ডানা দেখে তুমি এসে বলো 'চোখ মুছে নাও এই আনন্দ রুমালে'!

লালন নূর

উড়ন্ত বিমানের ছায়া

বাতাস হয়ে গাছের পাতা নরম সুরে আঁকো, তোমার হাতে রঙিন সুতা তোমার হাতে সাঁকো। কাঠের ফ্রেমে 'যাও পাখি'টা দেয়াল জুড়ে থাকে, হাজারতম গানের কথা তোমার নামে ডাকে। কুরুশকাঁটা ফুটিয়ে তুলে ফুলের নামে ছল, বিমান হল আকাশ জুড়ে জেদী হাওয়াকল! মাছরাঙাটা গাছের গায়ে ঠুকরে ইতস্তত – ঠোঁটের তাপে লুকিয়ে রাখে গাছের যত ক্ষত। কিন্তু সে গাছ তোমার নামে ফুলের নামে কাঁপে, বিমান উড়ে গেলে সে ফুল ফুটছে অভিশাপে। তুমি তখন আমার অবিশ্বাসে ফোটাও গ্লানি, মুদ্রা ছাড়া নাচের ঢঙে তোমার নামে জানি – আমার যত বংশরেখা, দেহের জন্মদাগ, এই নিখিলে তুমি মালিক 'লাগ ভেলকি লাগ'। ভেল্কিবাজি যাদুর টোনা অবাক দুটি চোখ, তোমার চোখে আমার রীতি ছায়ার ছবি হোক। আমি তোমার ছায়াতে ফুল, আমি তোমার কায়া; বিমান উড়ে বিমান উড়ে কোথায় খুঁজি ছায়া!

বিমানবালা-পাখির দেহ তোমার গাছে গাছে, ছায়া আমার কায়া আমার বিমান হয়ে নাচে। বিমান হয়ে উড়ছে পাখি তোমার হাতে পাখা, তীব্র রাতে আকাশ জুড়ে তোমার নামে রাখা – আমার হাতে তসবি দানা, আমার হাতে ছই; পাখির চোখে আমি তোমার বিমানবালা হই।

লালন নূর

পরম আনন্দের অনল

বাতাস ছুঁয়ে গেলে গাছের পাতারা জেগে ওঠে, আর আমি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হই। আমার এই প্রকাশ নিয়ে আমি নিজ সত্ত্বা রূপে আত্মা হয়ে উঠি। যেইমাত্র অস্থি ও নেতির ভাব বিবেচনা করে স্থিতির বিভ্রমে সংগতি লাভ করি, তখনই হয়ে উঠি দৃশ্যমান ঝড়; লোকে তাকে বলে অস্থির বটগাছ! আমি তো আসলে ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আসি অমায়িক হালুম – আমি আসলে আত্মপ্রকাশের রূপ ধারণ করে বিরাজিত সেই হাহাকার জাগানিয়া জীবাত্মা। বাতাস হলো অস্তিমান হওয়ার বাসনায় দৃশ্যরূপে জেগে ওঠা আত্মা, আমারই অহঙ্কারের বীজ! এভাবেই আমি ও আমরা পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

যখন আমি অনন্ত সুখরাশি পুড়ে ফেলে নরক-অনলে পানি দিয়ে আসি, তখন খুলে পড়ে তোমার অবগুণ্ঠন। এভাবে আমি নিঃসঙ্গের সারথি হয়ে উঠি। অনঙ্গ লিপ্সার আলোয় মিশে গিয়ে তোমার খুব কাছে চলে আসি; পরম আনন্দের অনলে পুষ্পযোগীরূপে প্রকাশিত হই।

'মাছধরা'
নিখিল চন্দ্র দাস
মাধ্যম: প্রাকৃতিক রং

রওশন রুবী

ক্রমশ দূরে যায় গৃহের ভুল

চারুবিদ্যের বাড়ি লিজ নিলো কারা কে জানে,

মিনাক্ষী বলেছিলো, যে নেয় নিক।

গ্রামেও আসবে শহরের সব কোলাহল;

অন্ধকার আর্তনাদ করে বলবে,

রাত যে যাচ্ছে মিশে সুরুজের পাড়ে

যেতে হবে আমাকেও এবার ফিরিয়ে স্বরূপ।

মিনাক্ষী আমি তারপর চারুবিদ্যেকে খুঁজতে

ওদের বাড়ি গেলে জানালার কপাট বন্ধ হয়ে যেতো

ঘরের ভেতর থেকে ঢেউ ভাঙা শব্দ ভেসে আসতো

মিনাক্ষী চমকে বলতো, এমন হাসছে কে?

কার ফুর্তীর অসুখ হয়েছে?

আমার কানে শুধু ঢেউ ভাঙা শব্দ যেতে যেতে

বলে যেতো চারুবিদ্যে ভালো নেই।

তারপর যতো যাই ক্রমশ দূরে যায় গৃহের ভুল

ক্রমশ বাঘ হয়ে যায় চারুবিদ্যে

মিনাক্ষীও এক সময় চলে যায় গ্রাম ছেড়ে।

মনের ভেতর কাজলের প্রলেপ টেনে দিয়ে

কে যেন বলতো,

কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে না স্বার্থ ছাড়া

কেউ কারো জন্য বিবাগি হয় না টান ছাড়া।

একদিন অধরা তোমার কাছে ফিরি
সমগ্র মন ব্যাকুল বাউল দেউড়িহীন, তুমি নিরাকার
কেবলই থেকে যায় মানুষ জন্মের আত্মঋণ
আমারও কিছু রয়ে গেছে, কিছু রয়ে যায় লৌকিক।
যেমন-পোড়ামাটি, নিজস্ব ঘ্রাণ, একাগ্র গোপন
কিছু কোলাহল, সাঁতারের ঋজু সময়।
তুমি তো জানো, এ ক্ষতিগ্রস্ত
থাকতে পারে না আসক্তহীন নিশ্চুপ
স্বপ্নের লাঙলে চষে দিতে দাও তোমার বিপুলভূমি।

রওশন রুবী

এপারে জল ওপারে অনল

কাব্য: ভালো না বাসলে পোড়ে না মানুষ। পুড়ছো কেন বলতো অরুণ?

অরুণ: কে বললো কাব্য, পুড়ছি আমি? দেখ কী ধবধবে যুবতী রোদ।
চলে যাচ্ছে বিকেলের উৎসব কোলে। রাত থেমে আছে দৃষ্টির উৎসে।

কাব্য: তবে কি তুমি অরণ্য ভালোবেসে দূরে ঠেলে রাখো ঘাস?
আর রাখতে রাখতে মেতে উঠো আলোতে মাতাল?

অরুণ: কেন বলবো তোমাকে অরণ্য আর ঘাসের কথা?
অরণ্য আমার গভীরতা, ঘাস পাঁজরের পেলবতা।
ও-ও-স-ব তুমি বুঝবে না। বাদ দাও...

কাব্য: এমন কঠিন কি! বললেই আমি সাঁতরে যাবো অনায়াসে তেরোশত নদী।
বললেই আমি ছুঁয়ে দেবো হিমালয়, কৈলাশ আর ভূমধ্যসাগরের ঢেউ।

অরুণ: আমাকে খননে এসো না। ভাঙনের শব্দ পৃথিবীর গহীনে প্রবেশের মতো
রোমাঞ্চকর এবং ভীষণ স্পর্শকাতর। শুধুই পরাভূত হবে।

কাব্য: জানতে পারিনি কখন, কেন বেয়ে চলে গেছো মানুষের দূর।
কেন অনুভব বুকে নিয়ে কুয়াশার জন্ম দাও?

অরুণ: মানুষ বড্ড অভাগা কাব্য। যা পায় না তাকে পেতে উন্মাতাল।
যা পেয়েছে তাকে কে মগ্নতায় ধরে রাখে বল?

কাব্য: নিজের সাথে কখনো যখন কেউ প্রতারণা করে, তখন
অক্ষয় কর্মের দিকে ধাবিত হতে পারে না সে।
পারে না অকৃত্রিম মানুষ হয়ে উঠতে।

অরুণ: পারে না বলেই আড়াল করে ভেতরের শ্রেষ্ঠত্ব।

কাব্য: আচ্ছা এটুকু বলো, তুমি কি উত্তাল পারাবার বহনে
নুয্য হয়ে কুড়াতে চাওনি ঘাসফুল?

অরুণ: না চাইনি।

কাব্য: তুমি কি অরণ্যের জন্য ব্যবচ্ছেদ করনি পথের নির্জনতা?
শ্লোগানে মুখর হয়ে যাওনি দূর থেকে দূরে?

অরুণ: না যাইনি।

কাব্য: অরণ্যকে ভালোবেসে লোপাট করনি হৃদয়ের ধার-দেনা?

অরুণ: না করিনি।

কাব্য: তারপর তুমি মেঘের হাত ধরে যাওনি গোধূলির ক্রিয়া দেখতে?

অরুণ: না যাইনি।

কাব্য: তুমি কি কাঠ ঠোকরার ঠোঁটকে অস্ত্র করে খোঁড়নি এ হৃদয়

অরুণ: না! না! না! না!

কাব্য: মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে অরুণ! তুমি কি চাও না
ধরিত্রি মোহে খণ্ডিত হোক? চূর্ণ হোক মিথ্যের চুঁড়া?

অরুণ: তোমার ইচ্ছে যেমন ভাবো কাব্য।
ইচ্ছের বুকে কে দিতে পারে বাঁধ?
কে ফেরাতে পেরেছে বিপরীত টান?

কাব্য: যদি দেওয়া যেত তবে 'এপারে জল ওপারে অনল'
কি নিতে বলতো দেখি, কি নিতে তুমি?

অরুণ: অনলে তৃষ্ণা আমার। পুড়েছে কৃষ্ণগহ্বর।
জলে আছে অপার ঘোর।
এপার ওপার পৃথক করা আমার কম্ম নয়।
রুগ্ন আমার বুকে কাঁটার আসর।
তুলতে এসো না, তুমি তুলতে এসো না।

কাব্য: তবে তাই হোক যা তুমি চাও। বিদায়ে বহন করি অমরত্ব।
যদি ক্লান্ত হয়ে পড় কখনো, যদি এক টুকরো রোদ চাই
স্যাঁতস্যাঁতে সময়ের উত্তাপে। তবে এসো।
এ হাত সর্বাগ্রে বাড়িয়ে রাখবে স্বাগত বাণী।

কুমকুম বৈদ্য

যুদ্ধে যাব

ঘুম থেকে রোজ উঠি যখন ভোরে
সূর্যটা ঠিক তোদের ঘরের চালে
কয়েক খানা ফুটো দিয়ে গলে
তোর গায়েতে ঢলাঢলি করে

মা তো তখন তুলসী তলা ধোয়
মনে মনে চালের হিসাব কষে
আমাকে দেয় পড়তে বসার তাড়া
সকাল বেলার শুকনো মুড়ির মুঠ

খানিক পরে দুই বিনুনি তুই
রাস্তা দিয়ে আড়চোখে যাস চেয়ে
ভোর বেলাতে তুই ও কি সে মেয়ে
পেট ভরা সব দিনের স্বপ্ন দেখিস

আমি তো ঠিক যুদ্ধে যাব চলে
সেথায় গেলে ভাতের হদিস মেলে
দেশ সীমানা ওসব বড় জিনিস
মোটা মাথায় ঢুকবে না
দু বছর ফেল ক্লাস নাইনের ছেলে

হাতের টিপ টা নিখুঁত হলেই হবে
আর দেখবে বুকের ছাতির মাপ
সেসব মিলে গেলেই
দেবে আস্ত জামা প্যান্ট
নতুন বুট জুতো
তেমন টি তুই দেখিস নি কক্ষনো

যুদ্ধ থেকে আর যদি না ফিরি
মোড়ের মাথায় শহীদ বেদি হবে
বাপের বাড়ি আসিস যদি তুই
আসার পথে আড় চোখে নিস দেখে

কুমকুম বৈদ্য

মহামারীর দিন

দমকা হাওয়া মাঝেমাঝে সন্ধ্যায়
নোঙর ফেলে আমার বারান্দায়
মন খুঁজে চলে নৌকার ঘরবাড়ি
আগামী দিনের এলোমেলো চিন্তায়

শহর এখন বন্দি নিজের ঘরে
ঝরা পাতাদের স্তূপ জমে দরজায়
চশমার কাঁচে অবসাদ শুধু ধরা দেয়
শরীরেরা সব বকুল গন্ধ জমা দেয়

নতমুখে শব মিছিলের সারি দীর্ঘ
অসহায় খিদে ফুটপাতে হাঁটে নগ্ন
তোমার আমার নিজ্‌ঝুম সব ভাত ঘুম
তাড়িয়ে বেড়ায় কিছু যুদ্ধের মরসুম

কুমকুম বৈদ্য

নামহীন কবিতা

আমি তো ডাকি নি তোমায়, তবু তুমি এসেছিলে

বলেছিলে পৃথিবীর পথে যত ভালোবাসা আছে

কুড়িয়ে দেবে আঁচল ভরে যেতে যেতে

সেই আলেয়ার ডাকে আমি মরুভূমি

আরশি নগরে সবুজ নৌকা ভাসিয়ে পথ চেয়ে থাকি

তুমি চলে যাও মাটি আর ঝলসানো রুটির খোঁজে

ক্ষুন্নিবৃত্তির নগর জীবন

আমি শুরু করি কিছু বকুলের চাষ

আমাদের যা ছিল আপাতত কুলঙ্গি তে তুলে রাখি

দু চার পাতা প্রেমের সংলাপ

ভাষান্তরিত কবিতা

মওলানা জালালউদ্দীন রুমি

মূল ফার্সি থেকে ভাষান্তর জাভেদ হুসেন

লায়লার গলির কুকুর

সেই এক কুকুরকে মজনু
কি ভালবেসে দিচ্ছিল চুম্বন

ভালবেসে তার আশেপাশে করছিল পরিভ্রমণ
যেমন হাজি ঘোরে কাবার চারপাশে

কখনো মাথায় কখনো পায়ে দিচ্ছিল চুমু
কখনো দিচ্ছিল তাকে মিষ্টি গোলাপ জল

এক নির্বোধ প্রশ্ন করলো– ও রে পাগল
এ কি ভন্ডামি তুমি করেছ শুরু?

কুকুর সর্বদা নোংরা ঘাটে
নিজের শরীর চাটে জিভ দিয়ে

এমনি করে করলো কুকুরের অনেক দোষ বর্ণন
দোষ জানা মানুষ রহস্য জানার কদর পেল না

বললো মজনু তুমি মজে আছ বাইরের আঙ্গিকে
ভেতরে এসো, দেখ আমার মতো অন্তরের চোখে

এতো খোদার কায়েম করা অলৌকিক কান্ড
এই কুকুর লাইলির গলির পাহাড়াদার

তার সাহস, প্রাণ, হৃদয় আর পরিচয় দেখো
কেমন জায়গা নিয়েছে বেছে করেছে আপন ঠিকানা

সে আমার একাকীত্বের সঙ্গী প্রিয়
সে আমার সমব্যাথী আমার দুঃখের ভাগীদার

ভাষান্তরিত কবিতা
মওলানা জালালউদ্দীন রুমি
মূল ফার্সি থেকে ভাষান্তর জাভেদ হুসেন

লায়লার গলির কুকুর

লায়লির গলিতে যে কুকুর নিবাস করে
তার পায়ের ধুলো সিংহের চেয়ে মহৎ

তার গলিতে নিবাস করে যে কুকুর
সিংহের বদলেও তার একটি পশম দেবো না আমি

সিংহও যার কুকুরের দাস হয়ে থাকে
তার মহত্ব বর্ণনা কী করে বা সম্ভব

বন্ধুরা! যদি বাইরের রূপ পার হতে পারো
তবে পুষ্পকুঞ্জ আর স্বর্গ তোমার চারিদিকে

যখন তুমি নিজের বাইরের রূপ পারবে ভাঙতে
তবে সকল রূপ ভাঙতে শিখে নেবে তুমি

তখন আর কোন বাহিরের রূপ দাঁড়ায় সামনে তোমার
হজরত আলীর মতো খায়বারের দ্বার উপড়ে ফেলবে তুমি

মওলানা রুমির কবিতা
মূল ফার্সি থেকে ভাষান্তর জাভেদ হুসেন

মজনুঁ'র শিরা কাটা

দূরে থাকার বেদনায় মজনুঁ'র
শরীরে উঠলো জেগে সহসা অসুখ

শোকের জ্বলনে তার রক্তে হলো জ্বলন
শরীরে হলো সেই জ্বলনের প্রকাশ

নিদান করতে এসে বৈদ্য জনালেন
রক্ত বওয়ানো ভিন্ন এর নেই প্রতিকার

আর রক্ত বওয়াতে কাটতে হবে শিরা
সেই শিরা কাটতে এলো এক অস্ত্রোপচারক

শল্যবিদ মজনুর হাত বেধে ছুরি নীল হাতে
মজনু রাগত স্বরে উঠল বলে– এ কি?

তুমি পারিশ্রমিক নিয়ে যাও এখান থেকে
আমি মরলে কি হবে আর, থাকবে না এই পুরনো শরীর

শল্যবিদ বলে– এই শিরা কাটায় ভয় কেন পাও
শুনেছি বনের বাঘকেও ভয় পাও না তুমি

তোমাকে তো অরণ্যের হিংস্র সব পশুরাই
চারদিক হতে ঘিরে রাখে রাত দিন

মওলানা রুমির কবিতা
মূল ফার্সি থেকে ভাষান্তর জাভেদ হুসেন
মজনুঁর শিরা কাটা

ছুরি ভয় পাই না আমি
ধৈর্য আমার অটল পাহাড় হতে বেশি

আমি সেই তীরের পেয়েছি আঘাত
এখন তীরের আঘাত না পেলে শান্তি লাগে
না আর

আমি প্রেমিক জেনে রাখো
ক্ষতমুখ আমার অহংকার

কিন্তু আমার সারা শরীরে তো ব্যপ্ত হয়ে
আছে লায়লা
এই শরীররূপী ঝিনুকে সেই মুক্তোরই
ঝলক শুধু

তাই হে শল্যবিদ! আমার ভয় হয়
শিরা কাটলে লায়লা আঘাত যদি পায়

যার হৃদয় শুদ্ধ বুঝবে শুধু সেই
আমাতে আর লায়লাতে তফাত নেই কোন

আমি লায়লা, লায়লা আমি
প্রত্যক্ষে দুই শরীর কিন্তু দুইয়ে এক প্রাণ

মওলানা রুমির কবিতা

মূল ফার্সি থেকে ভাষান্তর জাভেদ হুসেন

লায়লাকে খলিফার প্রশ্ন আর প্রশ্নের জবাব

খলিফা প্রশ্ন করলেন লায়লাকে, তুমি কি সেই
যার কারনে মজনুঁ পাগল হয়ে ফেরে?

অন্য সুন্দরী তরুনীদের চেয়ে তুমি তো শ্রেষ্ঠ নও
লায়লা বললেন– চুপ করুন, আপনি তো মজনুঁ নন

মজনুঁর চোখ যদি আপনি পেতেন
দুই জগতের প্রতিষ্ঠা ছাড়তেন অবহেলায়

আপনি আত্মমগ্ন মজনুঁ আত্মহারা
প্রেমের পথে চতুরতা বাজে ব্যাপার

কন্যাতীর্থ

মনিরা রহমান

নতুন বাসায় আসতে না আসতেই দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। প্রায় সারারাত মালপত্র সমেত ট্রাকে চেপে এক শহর থেকে আরেক শহরে। ভোরবেলা রেশাদের অফিসের কোয়ার্টারে। চারতলা দালানের নিচতলা। গরমে ঘেমে ঘেরাটোপের মধ্যে এতটা সময় বাচ্চা কোলে বসে থেকে অবসন্নবোধ করে ময়না। কোণের দিকে একটা ঘরে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে কাপড়-চোপড় সমেত। তারপর সারাদিন বাসা গুছানোর কর্মযজ্ঞ সাথে দুইমেয়ে টিয়া আর মুনিয়ার দেখাশোনা। তবু নতুন বাসায় রাতে আর ঘুম আসছিলো না ময়নার। একবার মনে হলো বিড়াল ম্যাও ম্যাও করলো। ফ্যানের বাতাসে আওয়াজ মিলিয়েও গেলো। রেশাদ আর দুই মেয়ে ঘুমিয়েছে বেশ রাত করেই। সবে চোখটা বুজে আসতেই আবার বিড়ালের চেঁচামেচি। ধ্বক করে ওঠে বুকের মধ্যে বাজরিগরগুলোর জন্য। কোথায় রাখা হয়েছে পাখি! ধরফর করে উঠে বসে ময়না। বিছানা থেকে নামতে যাবে,

মুনিয়া কেঁদে ওঠে। মায়ের বুকে মুখ গোঁজার চেষ্টা করে খাবার জন্য। ঘুম ভেঙে খেঁকিয়ে ওঠে রেশাদ– উফ! থামাতে পারো না পাখির বাচ্চাকে? সারারাত এগুলোর অত্যাচার সহ্য করা লাগবে নাকি? সব প্যানপ্যানানির গুষ্টি! সারারাত জাগো, সারাদিন অফিস কী তোর বাপ করে দিয়ে যাবে? মুনিয়াকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে দিতে, ময়না অনুরোধ করে রেশাদকে– বাইরে দ্যাখো না একটু পাখির খাঁচাটা। রেশাদ গজগজ করে পাশ ফিরে শোয়– হু যত্তোসব মেয়েমানুষ, জীবনটা তিতা করে দিলো!

আবার যেনো পাখির ডানার আওয়াজ পাওয়া গেলো। ঘর থেকে বের হয় ময়না। ডাইনিং স্পেস এর এক কোণে খাঁচাটি, তাতে কিছু নীল সবুজ পালক পড়ে রয়েছে শুধু।। খাঁচার শিকে কিছু রক্ত। আসতে দেরি হয়ে গেলো। সব কিছুতেই এমন দেরি হয়ে যায়। ধপ করে বসে পড়ে খাঁচার পাশে। চোখের পাপড়িতে জল লেপ্টে যায়। নীল সবুজ হলুদে মেশা রঙের যাদু। কি আদর! কি মায়া! ঠুকে ঠুকে দানা খায়, জল খায়। ভয় নেই, ভাবনা নেই!মুনিয়া হাঁটতে শিখেছে সবে একপা দুপা করে। পাশের বাসার বারান্দায় বিশাল খাঁচায় অজস্র রঙিন পাখি দেখিয়ে তাকে খাওয়ানো সহজ। পাখি দানা খায় মুনিয়াও। পাখি ডাকে চুই চিক বাচ্চা খুশিতে গলে যায়। তাই সেখান থেকে আসবার সময় উপহার পাওয়া এমন মনকাড়া পাখি। রাস্তার অনেকগুলো মাইলফলক পার হয়ে নতুন শহর, নতুন বাসা। তবুও সেই খাঁচা। তারমধ্যে আরো আরো খাঁচা। কোনোটায় পাখি, কোনোটায় প্রাণপাখি! কতদূর ফেলে আসা উড়াল জীবন! শুকতারা সকাল, বাতাসের সাথে দৌড়ে চলা বিকেল। মাথায় রোদ বৃষ্টি নিয়ে পুকুরের সবুজ জলে দীর্ঘ সাঁতার, ডুব দিয়ে মাছেদের কাছে। গলা খুলে অবিরাম হা হা হি হি। সেইখানে জমিনে, গাছেদের ডালে, বাড়ির চাল জুড়ে পাখিদের কলতান। মাঠের ঘাস থেকে ঘুড়ি আকাশের নীল মাঠে। তারপর ভোকাট্টা। ছোঁ দিয়ে নিয়ে এলো চোরা শিকারী। যুক্তিতে বেঁধে দিলো ইঁদারার দড়ি। মন আর শরীর ক্রমশ ভারি। জল আর ভেজায় না। করে তোলে স্যাঁতস্যাঁতে।

প্রবল ধাক্কা। ভেতরের ময়না বের হয়ে আসে। খেকিয়ে ওঠে রেশাদ– এইখানে কী? মেয়েরে থামাও। তোমার মেয়ের পিরিতের পাখি কী করলা? তিন মা মেয়ে মিলে আমার জীবন শেষ করলা। এদের পাহারা দিতে দিতে....., শক্ত হাতের একটি থাপ্পড়ে ময়নার গালে জ্বালা করে ওঠে। মুনিয়া টলমলো পায়ে মার কাছে যেয়ে জাপটে ধরে বলে– পিকি নাই !পিকি আয়!

আকাশ ফর্সা হতেই দৌড়ে দৌড়ে কাজ। রেশাদ তার খাবার নিয়ে বের হয় অফিসে। অন্য সময়ের মতো বাইরের দরজায় তালা দিতে ভুল করে না। ভেতরে ময়না সংসার পরিপাটি করে। বারবার নজর যায় খাঁচার দিকে। ওটি ঘিরে তিনজন কাটাবে প্রহর ভেবেছিলো। টিয়া মুনিয়া শূন্য খাঁচা নিয়ে বসে থাকে। ওরা এখনো বুঝে ওঠেনি নিজেদের খাঁচার বেদনা। সুন্দরকে ঢেকে ফেলতে হয়, নাহলে দশজনের দৃষ্টিতে মলিন হয়ে যায়। নোংরা হয়ে যায়। বাড়ি ঢেকে ফেলতে হবে। জানালায় ভারি পর্দা, বারান্দায় বাঁশের চিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। সেইসাথে বাড়ি, মেয়েদের।

দুপুর হয় হয়। মুনিয়াকে কী দেখিয়ে খাওয়ানো যাবে ভেবে সারা হয় ময়না। টিয়া

এ জানালা ও জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেয়। পেছনদিকে ঘরের লাগোয়া বারান্দা। সেইখানে চিক নেই। সেখান থেকে দেখা যায় কিছু গাছ। মফস্বলি আবহ। বিল্ডিংয়ে ভর্তি নয়। টিয়া মাকে সেই বারান্দায় টেনে নেয়, বলে– এইখানে পাখি আসবে। আপুন খাবে। সত্যি একটু করে ডাক শোনা যায়। টিয়া তার ছোট্ট পাখি বাঁশিতে ফুঁ দেয়। উড়ে আসে বুলবুলি আর দোয়েল। কাঠঠোকরা ডুপ ডুপ শব্দ করে এক গাছে। উঁচু ডালে বসে হলুদ কালোয় মিশানো বেনে-বৌ। বারান্দার ঘুলঘুলিতে চড়ুই এসে বসে। নীম গাছে হুটোপুটি করে শালিকের দল। খিলখিল হাসিতে মায়ের কাছে খেতে থাকে মুনিয়া। মুঠো করে মুড়ি ছিটায় টিয়া। বাতাসে উড়তে থাকে সফেদ মুড়ি। বাতাবীনেবু গাছে এসে বসে লাল ঠোঁট সবুজ টিয়া। আড়ে চায়। দুপুর রোদ্দুরে চারদিক নীল আর সবুজে মাখামাখি হয়ে ওঠে। বাতাবী নেবুফুলের সুরভীর সাথে হঠাৎ মেশে ধোঁয়ার গন্ধ। একটুকু হৈচৈ শোনা যায় বুঝি! দরজায় বাড়ি পড়ে দুম দুম। দূরে ঘুঘু ডাকে ঘু-ঘুউ-ঘু। ঠিক সেই সময় তিনটি পাখি বারান্দার গ্রিলের ফাঁক গলে উড়ে যায়, থালায় পড়ে থাকে আধ খাওয়া খাবার।

অভিমান

আবুল বাসার

কুশলাদি বিনিময়ের পরে জিজ্ঞাসা করে শামীম,

'তোর কাজকাম কেমন চলছে?'

'কাজতো চলছে অনেক। আর কামের খবর সুহাসকে জিজ্ঞাসা করিস, ও ভালো বলতে পারবে!'

হাসতে হাসতে জবাব দেয় নীলু। সুহাস নীলুর বর। আবার সহপাঠীও ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শামীম নয় কেবল, সহপাঠীদের অনেকের সাথেই নীলুর এরকম খোলা সম্পর্ক। কোন পর্দা না রেখে কথা বলার নৈকট্য। এই স্বভাবের জন্য সুহাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে নাম দিয়েছিল 'পোলামেয়ে'।

'তোকে একটা খবর দিতে ফোন করেছি। খোকনের কোলন ক্যান্সার ধরা পড়েছে; ফোর্থ স্টেজ। সিঙ্গাপুর থেকে ডাক্তার দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। জানিনা, এই খবরের কোন গুরুত্ব তোর কাছে আছে কিনা। তাও মনে হলো, তোর জানা দরকার। তাই ফোন দিলাম। খোকনটার জন্য খুব কষ্ট হয়রে নীলু।'

নীলুর মন্তব্যের জবাব না দিয়ে মুল কথায় চলে যায় শামীম। বলতে বলতে গলা ধরে

আসে শামীমের। এটুকু বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখে শামীম।

নীলুর কক্ষে হঠাৎ আকাশ থেকে বজ্রপাত নেমে আসে। তার নিনাদ এবং ঝলাকনিতে চেয়ারের সাথে আটকে যায় সে। কৈশোরে অনেক রাতে ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরতো নীলুকে। তখন মুখ দিয়ে কথা বেরোত না, হাত পা নাড়তে পারতোনা। এই মুহূর্তে অবশ্য একটা ঝরঝরে তকতকে দিন। তার অফিস রুমেও অনেক আলো। তবুও তাকে বোবায় ধরেছে। অনেক বছর পরে বোবায় ধরেছে।

চোখের সামনে একটা হলুদ সর্ষে ক্ষেত দেখতে পায় সে। সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানা। ঢাকা-রংপুর মুল সড়ক থেকে বাম দিকে ঢুকে পড়েছে এক চিলতে রাস্তা। তার এক পাশে বাড়ীঘর, চায়ের দোকান, দড়িতে ঝুলানো কিশোরী মেয়ের লাল জামা আর কালো পায়জামা, মধ্য বয়সী নারীর সাদাসিধা শাড়ী। অন্য পাশে মাঠ। বিশাল দিগন্ত জোড়া মাঠ। এক পাশে তাতের শব্দ; অন্য পাশে হলুদের নৈঃসর্গ। একদা সেখানে গিয়েছিল নীলু। গিয়েছিল যে সে কথা মনে ছিল কিন্তু গত তিন বছর স্মরণে ছিল না। আজ বজ্রাঘাতে মস্তিষ্কের কোষে তীব্র আলো ঢুকে পরে তার। সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। খোকনের সাথে একবার গিয়েছিল সে বেলকুচি। চার বছর আগে।

অফিস সহকারী নাজমা কফির মগ নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে। নীলু ম্যাডামের কফির মগ তার হাতে। সময় মতো কফি না দিলে খুব বকাঝকা দেন তিনি। সাড়ে এগারটার আগে কিংবা পরে হলে চলবে না। ঠিক সাড়ে এগারোতেই কফি চাই নীলুর। নাজমার প্রবেশে বোবা থেকে মুক্তি পায় নীলু। মানুষের পায়ের আওয়াজ বা স্পর্শ পেলে বোবা পালায়। অভ্যাস মতো নিঃশব্দে আগমন ও নির্গমন নাজমার। বোবা থেকে মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়ায় নীলু। কফির মগে হাত দেয় না আজ। জানালার পাশে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দেয়। চেষ্টা করেও জানালাটা খুলতে পারে না। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত রুম বলে অনেকদিন খোলা হয় নাই এই জানালা। জং ধরে ছিপি নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মতো। এক হ্যাচকায় খোলা যাবে না। পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে নীলু। রাস্তার অপর পাশের সাদা দালানের কার্নিশে কালো বিড়াল বসে তার দিকে চোখ লাল করে তাকায়। চোখ নামিয়ে রাস্তায় তাকায় নীলু। কালো আলখাল্লা পরা একজন মানুষ রিক্সা থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে। আলমারকাজুলের এম্বুলেন্স রিক্সাটার পিছনে জোরে ভেপু বাজায়। রিক্সাচালক 'আল্লাহু আকবর' বলে গাড়ীটি যাওয়ার রাস্তা করে দেয়। জানালার পাশ থেকে সরে আসে নীলু।

চেয়ারে এসে বসে। ডোরাকাটা কৌটাটা হাতে নেয়। সাথেই থাকে কৌটাটা সব সময়। কিন্তু সচেতনভাবে সেটার মুখ খোলা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে গেছে এতদিন নীলু। তারপরেও মাঝে মাঝে এর ভিতর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য মুখ তুলতো

প্রথম চুম্বনের লজ্জাদ্র সুখ, প্রথম সঙ্গমের শৃঙ্গার, কিংবা বেলকুচির সর্ষে ক্ষেতের জ্যোস্না-প্লাবন; আরো কত কি! জোরে চাপ দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করতো। কি নেই এই কৌটায়? প্রথম প্রেমের দুতিয়ালী, টিএসসিতে খোকনের জামায় আইসক্রীমের দাগ, ব্যতিক্রম চত্বরে মুখে আলুচপের গরম ভাপ, মধ্যরাতের আনন্দ গোঙ্গানি, তারস্বরে চেচামেচি, তারপর 'কাল থেকে তোমার পথে তুমি, আমার পথে আমি!' সবই জমা আছে এই কৌটায়। বজ্রাঘাতে তার মুখ ঢিলা হয়ে গিয়েছে একটু আগে। সব বের হয়ে আসতে শুরু করছে যেন এক এক করে। বাধা দেয় না নীলু। আসুক সব আজ ঝড়ের মতো। উড়িয়ে নিয়ে যাক সব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তখন নীলু। সুহাস, শামীম, ইশতি, ইমন, নোরা, সুমনা আর তার ছোট্ট একটা বন্ধু মহল গড়ে উঠেছে এর মধ্যে। সুমনার সাথে ইমনের আর নোরার সাথে ইশতির ইটিসপিটিস প্রেমের রুপ নিয়েছে এর মধ্যে। বাকী রইলো সুহাস, শামীম আর নীলু। সুহাস নীলুকে পছন্দ করে বুঝা যায়, কিন্তু এখনো বলতে পারেনি।

শামীমের বন্ধু খোকন। স্থাপত্যকলায় পড়াশোনা করছে বুয়েটে। শামীমের মাধ্যমে সেও এসে ভর্তি হয় নীলুর বন্ধু মহলে। প্রতিদিন দুপুরে চলে আসে ফুলার রোড ধরে। গন্তব্য টিএসসি। উদ্দেশ্য নীলু। সেটা বুঝতে পারে সবাই। নীলুও বুঝতে পারে। ভালোও লাগে ঝোলা কাধে অগোছালো চুলের এই আউলাবাউলা যুবকটিকে তার। আর আর্কিটেক্ট মানেইতো একটি শৈল্পিক পেশা। ব্যাংকে বসে টাকার হিসাব কিংবা হাসপাতালে বসে রোগী দেখাতো নয়! প্রেম হয় তাদের। দুজনের ভালো লাগা থেকেই প্রেম হয়। বিয়ের আগ পর্যন্ত চুটিয়ে প্রেম করে তারা; নির্লজ্জের মতো। সন্ধ্যার দিকে ফুলার রোডের ফুটপাতে বসে ওরা যখন একজন আরেকজনের গা ঘেষে বসতো একটু উষ্ণতার জন্য, তখন সলিমুল্লাহ হল ফেরত ছেলেরা টিপ্পনী কাটতো দূর থেকে। খোকন তখন নীলুকে বলতো,

'ওরা অভাগা, ওদের জীবনে কোন নীলু নেই। তাই ওদের হিংসা হয়! আমি সুভাগা। আমার নীলু আছে।'

শুনে খিল খিল করে হেসে উঠতো নীলু।

'সুভাগা আবার কোন শব্দ?'

'এটা অভিধানের শব্দ না। এটা কেবল আমার মুখে উৎপাদিত-উচ্চারিত আর তোমার কানে আহরিত-আশ্রিত শব্দ।'

খোকন জবাব দিতো।

কিন্তু সুভাগা শব্দটা বেশী দিন প্রাণ পায়নি। পড়াশোনা শেষ করে খোকন এবং নীলু

যে যার যার মতো পেশায় মনোনিবেশ করে। নীলু চাকরি নেয় সুহাসের এডভাটাইজিং ফার্মে। এই ব্যবসাটা সুহাসদের পারিবারিক। পরীক্ষায় পাশ দিয়ে একমাত্র ছেলে হিসাবে বাবার কাছ থেকে এই ফার্মের দায়িত্ব বুঝে নেয় সুহাস। বিশাল বড়লোক লোকমান সাহেব। ছেলের হাতে এডভাটাইজিং ফার্মের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমুহের দিকে মনোযোগী হন। খোকন আপাতত একটি কনসাল্টেন্সি ফার্মে যোগ দেয়। তার লক্ষ্য হচ্ছে নীলুকে ঘরে তোলার আগেই নিজের একটা ফার্ম দাড় করানো। সেই লক্ষ্যে সকাল বিকাল খেটে যাচ্ছে সে। সফলও হয়। ফার্মের নাম দেয় 'নীলুজ টাচ'।

এরপরের গল্পটা খুব সাধাসিধে। রেওয়াজ মেনে বিয়ে করে ওরা। বিয়ের পর বাসর করার জন্য নীলুকে নিয়ে ঢাকার বাসায় না উঠে বেল্কুচি নিয়ে যায় খোকন। দুইদিন থাকে কাঞ্চনকান্তি গ্রামে। খোকনের বাপ দাদার ভিটা সেখানে। বিরাট পাকা বাড়ী। তার পিছনে গাছ গাছালীতে ভরা। দুই দিকে পুকুর। বাড়ীর সামনে বিরাট উঠান পেরিয়ে সরকারী পাকা রাস্তা। পরিকল্পনার কিছুটা আগেই জানিয়েছিল খোকন নীলুকে। আর্কিটেক্টের পাগলামি দেখে হেসেছে নীলু। কিন্তু অমত করেনি।

খোকন অবশ্য সবটুকু আগেই বলেনি। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে খোকন নীলুকে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। সেদিন ভরন্ত পূর্ণিমার রাত। পাকা রাস্তায় কারো আধুলি পড়ে গেলেও সেটা কুড়িয়ে পাবার মতো চাঁদের আলো। রাস্তার ওপাশে একরের পর একর সর্ষে ক্ষেত। আকাশ থেকে কুয়াশা পড়ছে নীচে। সেকথা মাথায় রেখে নীলুর গায়ে চাদর জড়িয়ে এবং মাথায় কানটুপি পরিয়ে দেয় খোকন। তারপর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় মাঠে।

নীলু এর আগে কোনদিন সর্ষে গাছের কাছে যায়নি। শীতের রাতে খোলা মাঠে হাঁটেনি। শহরের কোনায় চাঁদ উঠেনা বলে ভরন্ত পূর্ণিমা দেখেনি। মাঠের মাঝখানে মাটির উঁচু একটি ঢিবি আছে। সেখানে কিছু চাষবাস হয় না। দিনের বেলা কেউ কেউ সেখান থেকে ঘাস কেটে নেয় গাই গরুর জন্য। লন্ঠন হাতে কয়েকজন লোক চোখে পড়ে ঢিবিতে। খোকন সেই ঢিবিমুখী হয়। নীলু বাধা দেয়। ভয় করে তার। কিন্তু খোকন শোনে না। নীলুর হাত ধরে নিয়ে যায় ঢিবিতে।

সেখানে মাটিতে বেতের মাদুর বিছিয়ে বসে আছে কিছু মানুষ। একটি মাদুর রাখা আছে খোকন এবং নীলুর জন্য। সেই মাদুরে নীলুকে নিয়ে বসে খোকন। নীলুর চোখে জগতের বিস্ময়। বুকের ভিতর আউলাবাউলা আর্কিটেক্টের জন্য অতল ভালোবাসা উথলে উঠে। খুব কাছে ঘেষে বসে সে খোকনের। সেই ফুলার রোডের মতো।

‘কই বয়াতী, এবার শুরু করেন দেখি আপনার গান!’

খোকন কাঁধে দোতারা ঝুলানো লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে। তখন দোতারাতে সুর উঠে, ঢোলে তাল উঠে, বাশীতে ফু পড়ে। আর হরমুজ বয়াতী গান শুরু করেন, ‘আমি তোমারো লাগিয়া যোগিনী হইবো...’।

শাহজাদপুর থেকে এই বয়াতী ও তার দলকে ভাড়া করে এনেছে খোকন। সেই রাতে খোলা মাঠে অনেক রাত পর্যন্ত গান বাজনা চলে। খোকন ও নীলুকে নিয়েও গান বেধে গেয়ে শোনান হরমুজ বয়াতী। মনে রাখার মতো রাত নীলুর জীবনে।

একটা কথা আছে, হরিণের নধর দেহ আর সুন্দর রূপই তার দুশমন। মাংসের জন্য বাঘ তার উপর হানা দেয়। পোষার জন্য মানুষ তাকে বন্দী করে। মানুষ কিংবা বাঘ কেউই সজারুর প্রতি হাত বাড়ায় না। যেই প্রানখোলা স্বভাব আর কিন্নরী হাসির জন্য খোকন নীলুর প্রেমে পড়েছিল, বিয়ের পর নীলুর সেই গুনই তার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়।

সুহাস ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান; ছোটবেলা থেকেই ব্যবসা বুঝে বড় হয়েছে। এত বেশী হিসাব নিকাশ বুঝে বলেই নীলুর সাথে তার প্রেমটা হয়ে উঠেনি। তার এডভাটাইজিং ফার্মের বড় বড় ক্লায়েন্টদেরকে দেখভালের দায়িত্ব সে নীলুর হাতে দেয়। সে জানে পুরুষ মানেই পরস্ত্রীর হাসিতে মুগ্ধ। আর সুন্দর হাসি আর আন্তরিক ব্যবহার নীলুর স্বভাবগত। ফলাফল দাঁড়ালো এই, অফিসে অনেক সময় চলে যায় নীলুর। খোকন প্রথম প্রথম মেনে নিলেও কয়েক মাস না যেতেই সেটা নিয়ে প্রায়ই তার ঠোকাঠুকি লেগে যায় নীলুর সাথে।

এমনিতেই এডভাটাইজিং ফার্মের কাজ নিয়ে অনেক কথা চাউর আছে বাজারে। নীলু আর খোকনের বাদানুবাদে সেসব কথাও চলে আসে। দূর নক্ষত্রের সান্ধ্য আলোতে ফুলার রোডে অথবা বেলকুচির সেই ভরন্ত পূর্নিমায় পরস্পরের গা ঘেষে বসার আকুতি ম্লান হয়ে আসে ক্রমশ। এক সময় তা সমুলে মারা যায়। দুই জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় কাজ, সময়মতো ঘরে না ফেরা, ঘরে ফিরে পরস্পরের সাথে কথা না বলা, আর সন্দেহ; এবং সুহাস। প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয় তাদের মধ্যে। তারস্বরে চেচামেচি শুনে কয়েকবার নীচ থেকে ইন্টারকমে ফোন এসেছে অভিযোগ জানিয়ে। হাপিয়ে উঠে দুজনেই।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। সন্ধ্যার একটু পরেই বৃষ্টি ঠেলে বাসায় এসেছে খোকন। নীলু তখনো ফিরেনি। খুব মন খারাপ হয়ে যায় তার। গোসল সেরে জামা

কাপড় পাল্টায় খোকন। তখনো নীলু এসে পৌছেনি। বাসায় খোকন তেমন কোন মদ রাখে না। তবে মাঝে মাঝে বাইরে দুই এক পেগ মদ সে খায়। একবার তার এক ক্লায়েন্ট তাকে একটা বিদেশি মদের বোতল উপহার দিয়েছিল। এতদিন খোলা হয়নি। সেটাই নিয়ে বসে সে আজকে। খায় কয়েক পেগ। এক সময় মাথা ঝিম ধরে আসে। টেবিলে মদের বোতল ও গ্লাস রেখে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে সে। ঘুমিয়েও পড়ে হয়তো কিছুটা একটু পর। তবে অগভীর ঘুম। একটু পর হুড়মুড়িয়ে উঠে অনবরত বেজে চলা দরজার ঘন্টির আওয়াজে।

নীলু বাসায় ফিরেছে। দরজা খুলেই লেগে যায় সে নীলুর সাথে। টেবিলে মদের বোতল এবং গ্লাস দেখে সব কিছু বুঝে নেয় নীলু। খোকনের কথার কোন জবাব না দিয়ে তার মতো করে জামা কাপড় পাল্টায় সে। নীলু বুঝতে পারে খোকনের মনে রাজ্যের রাগ, গোস্বা। সে এটাও বুঝতে পারে এত রাত করে ঘরে ফেরা তার উচিত হয়নি। আসলে তারও কিছু করার ছিলো না। একটা ডিনার মিটিং ছিল স্কয়ার কোম্পানির সাথে। এই কাজটা খুব গুরুত্বপুর্ন তার জন্য। সকালে খোকনকে সেটা বলে যেতে খেয়াল ছিল না।

সেই রাতে দুজনের কারোই ঘুম হয় না। সারারাত তারা ঝগড়া করে। নীলু তার আজকের দোষ মেনে নেয়। কিন্তু খোকনের মনে হিসাব নিকাশটা কেবল আজকে কে নিয়ে নয়। হিসাব নিকাশটা সুহাসকে নিয়ে। নীলু যেমন জানে, খোকনও তেমনি জানে সুহাস নীলুকে পছন্দ করে। নীলুর মাধ্যমেই জেনেছে খোকন। এই জন্যই খোকনের মনে সন্দেহটা। সে নীলুকে কয়েকবার বলেছে সুহাসের ফার্মের চাকুরীটা ছেড়ে দিতে। অন্য কোন চাকুরী খুজে নিতে। নীলু সেটা এড়িয়ে যাচ্ছে। সেই রাগ সময়ে অসময়ে ফেনিয়ে উঠে খোকনের মনে। আজকেও উঠেছে। নীলুকে সে সাফ জানিয়ে দেয়,

'কাল সকালে এই বাসা ছেড়ে চলে যেও তুমি। আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। কাল থেকে তোমার পথে তুমি, আমার পথে আমি।'

খুব কষ্ট পায় নীলু। দুইজনের সংসার জীবন এক বছরের হলেও প্রায় পাঁচ বছরের সম্পর্ক তাদের। তার কোন দাম নেই খোকনের কাছে। কেবল সন্দেহের বশে সব শেষ করে দিতে চায় খোকন। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে খোকন। নীলু ঘুমাতে পারে না। ঘুম আসে না। সকালে খোকনকে ঘুমে রেখেই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে নীলু।

তখন তার পাশে এসে দাঁড়ায় সুহাস। দ্বিতীয় পুরুষের আগমনে যা হবার সেটাই হয়। নীলু আর কোনদিনই ফেরত যায়নি তার পুরানো বাসায়। আর কোন নারীই যায়নি কোনদিন সেই বাসায়। খোকন আর বিয়ে করেনি। তার মনে এখনো একটাই প্রশ্ন, 'পাচ বছরের এত আয়োজন, এত নিবেদন, এত ভালোবাসা, মদ্যপানে বিষন্ন এক মাতালের মুখের এক কথার কাছে পরাজিত হয়ে গেলো!' এইভাবেই শেষ হয়ে যায়

অভিমান

আবুল বাসার

ভরন্ত জোসনা রাতের বয়াতীর সুর আর জোসনা ভেজা সর্ষে ফুলের বিস্ময়।

শামীমের ফোন পেয়ে তখনই খোকনকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যায় নীলু। সুহাস যেতে চেয়েছিল তার সাথে। নীলু রাজী হয় না। সে শামীমকে সাথে নেয়। খোকনের তখনো হুশ জ্ঞান আছে। সে মানুষ চিনতে পারে এবং তখনো তার স্নায়ুদৌর্বল্য শুরু হয়নি। খোকনকে দেখভালের জন্য পালাক্রমে তার মা ও বোনেরা হাসপাতালে থাকে তার পাশে। হাসপাতালে খোকনের বোন দীপার সাথে দেখা হয় শামীম এবং নীলুর। তাদেরকে বাইরে রেখে দীপা খোকনের কাছে ওদের আসার খবর দেয়। শুনে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় খোকন। বোনের কাছে মিনতি করে কোনভাবেই যেন নীলুকে ভিতরে আসতে দেয়া না হয়। অত্যাসন্ন মৃত্যু দিয়ে সে তার করুনা কিনতে চায় না। গত তিন বছর সে অপেক্ষা করে গেছে একটি ফোনকলের জন্য। একবার দেখা করার জন্য। মন গলেনি নীলুর। বার বার সে ফোন দিয়েছিল; নীলু সেই ফোন ধরেনি। মাতাল মুহূর্তের এক কথার যে শাস্তি নীলু তাকে দিয়েছে, সেটা সাথে নিয়েই সে বরং কবরে যাবে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে নীলু। দেখা হয় না খোকনের সাথে। এর কিছুদিন পর সব দেখাদেখির উর্ধ্বে চলে যায় খোকন। তার ভিতরে পুষে রাখা অভিমানের অনুতাপটুকু নীলুর ভিতর গুজে দিয়ে যায় সে।

সময়সুযোগ করতে পারলেই নীলু বেলকুচি যায়। সর্ষে ক্ষেতের আইলে খোকনকে খুঁজে। সারাদিন কাটিয়ে বিকেলে ফিরে আসে। অনেক সময় বাঁধ ভাঙ্গা চোখের জল নেমে আসে নীলুর। সবার অলক্ষ্যে সে জল মুছে ফেলে সে। খুব রাগ হয় তার খোকনের উপর। অভিমানও।

‘বেহুলা’
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
মাধ্যমঃ সেরোগ্রাফ

অণুগল্প

রুখসানা কাজল

দক্ষিণের বারান্দা

দক্ষিণের বারান্দা খুলে দিলেই হুহু ঘন বাতাস!

ঝরা পাতার মত কাঁপন ওঠে শরীরে।

হালকা শালে নিজেকে মুড়ে মগভর্তি কালো চা আর তোমার সেই উলোক ঝুলোক ফুটনোটগুলোর যেগুলোতে বিষ মেশানো----

নাহ্ মনে পড়ে না!

একটুকুও মনে পড়ে না। বিশ্বাস করো ভুলেই গেছি বিষময় তোমাকে! মাউস ঘুরিয়ে ভুলেও দেখিনা তোমার মুখ! দিব্য জানি, আমাকেও দেখো না তুমি!

তবু কি পাঠালো অনিন্দিত এই অঘ্রাণ! এ তো যুদ্ধ বার্তা নয়!

অমল শুঃ ধবল জলের সাদা ফুল! কোথায় সেই দাহ্য অক্ষরের রণ হুংকার!

তবে কি মনে পড়ে! পড়ে বুঝি! পোড়ে? কতখানি? তুমি কি হেরে যাচ্ছ প্রিয় যুদ্ধবাজ! তোমার নিরঙ্কুশ অহংকারে আমি যে স্থলপদ্মের গাছ লাগাবো বলে বীজ পুষেছি!

কেন যেন মনে হয় অজস্র শীতবিকেল পায়ে মেখে ফিরে আসবে তুমি। নাভিশ্বাস তুলে আবার অসহিষ্ণু বেজে উঠবে কলবেল। স্যু র‍্যাকে স্যু আর লন্ড্রিতে মোজা রেখে চা করতে করতে দেখব তোমার কপালজুড়ে রূপালি জলভূমি।

ইচ্ছে হলেও চুমু খাবো না। আমাদের কোন কথা নেই। স্পর্শ নেই। যৌনতা নেই। তাপ উত্তাপহীন সকাল দুপুর রাত জমে জমে হিমবাহ হয়ে যাবে।

আমরা পেরুতে পারব না। পেরুনো যায় না যে! কিছুতেই না।

রুখসানা কাজল

কুরান পুরান পরাজিত সময়ঃ ওরা কারা

বিড়িটা দুই ভাগ করে এক ভাগ কানে গুঁজে রাখে কুরান। ফজলু বিশ্বাসের বাড়ি ডেইলি মজুরিতে কাজ নিয়েছিল ওরা। কিন্তু পুরানের গায়ে জ্বর, মাথায় ব্যাথা, মুখে অরুচি।

সাত সকালে পুরানের বউ এসে জানিয়ে গেছে, ওদ্দা সে তো যাতি পারবি নানে। ফজলু কাগারে এড্ডু বুঝায়ে কইও দিনি।

কাজ শেষে ঘরে ফিরছিল কুরান। মিলু মিয়ার হোটেলের ম্যানেজার সন্তোষ ঘোষ টাকা গুণতে গুণতে ডাক দেয়, ওরে ও কুরান ইদিকে আয় ভাডি। ওই দেখ জানালার পাল্লাডা ভাঙি পড়িছে। শীত আসি গেল। কাল পরশু আসি ঠিক করি দিস দিনি সব।

এহুনি দিই কাগা?

কাজ শেষে মজুরির টাকা থেকে কুরান চল্লিশ টাকা দেয় সন্তোষকে, কয়ডা পরোডা ডাল লাবড়া দেও দিনি কাগা।

ক্যাশ ছেড়ে ভেতরে যায় সন্তোষ ঘোষ। কিছুক্ষণ পর একটি গরম প্যাকেট কুরানকে দিয়ে হাসে, সকালের তা গরম করি দিলাম। আর নে টাকা লাগবিনা । আরো মেলা কাজ আছে বুঝিছিস। তোর দোস্তোরে নিয়ি কালকে চলি আসিস।

কুরান কথা দেয় এখন ও একা করবে। দোস্ত সেরে উঠলেই ওর সাথে কাজে আসবে।

জ্বর হলেই পরোটা খেতে ভালবাসে পুরান। কুরানের আনা পরোটা পেয়ে কতক্ষণ থালাখানা নাকের কাছে ধরে রাখে। ডালডার গন্ধ শোঁকে। তারপর খুশি খুশি হয়ে খুব সাবধানে আস্তে করে একটুখানি পরোটা ছিঁড়ে নেয়, খা কুরান। ইট্টু খা। কি সুন্দর ঘিরান রে মনা! মনে কয় একশডা পরোডা খায়ি ফেলাই।

কুরান খেয়ে হাত ধুয়ে আসে। পুরান হাত ধোয় না। শিশুর মত বলে, হাত ধুলি ঘিরান চলি যাবিনি যে।

দু কানের পাশ থেকে দু টুকরো সিগারেট বের করে কুরান, হাত ধুয়ে নে ভাডি। কালকে বেশি করি আনি দিবানি। তহন আবার খাস।

পুরানের চোখ হাসে, সত্যি? ক তোর আল্লার কসম?

জ্বলší সিগারেটের টুকরোটা পুরানের হাতে দিয়ে হাসে কুরান, কলাম ত! তোর ভগমানের কিরে---

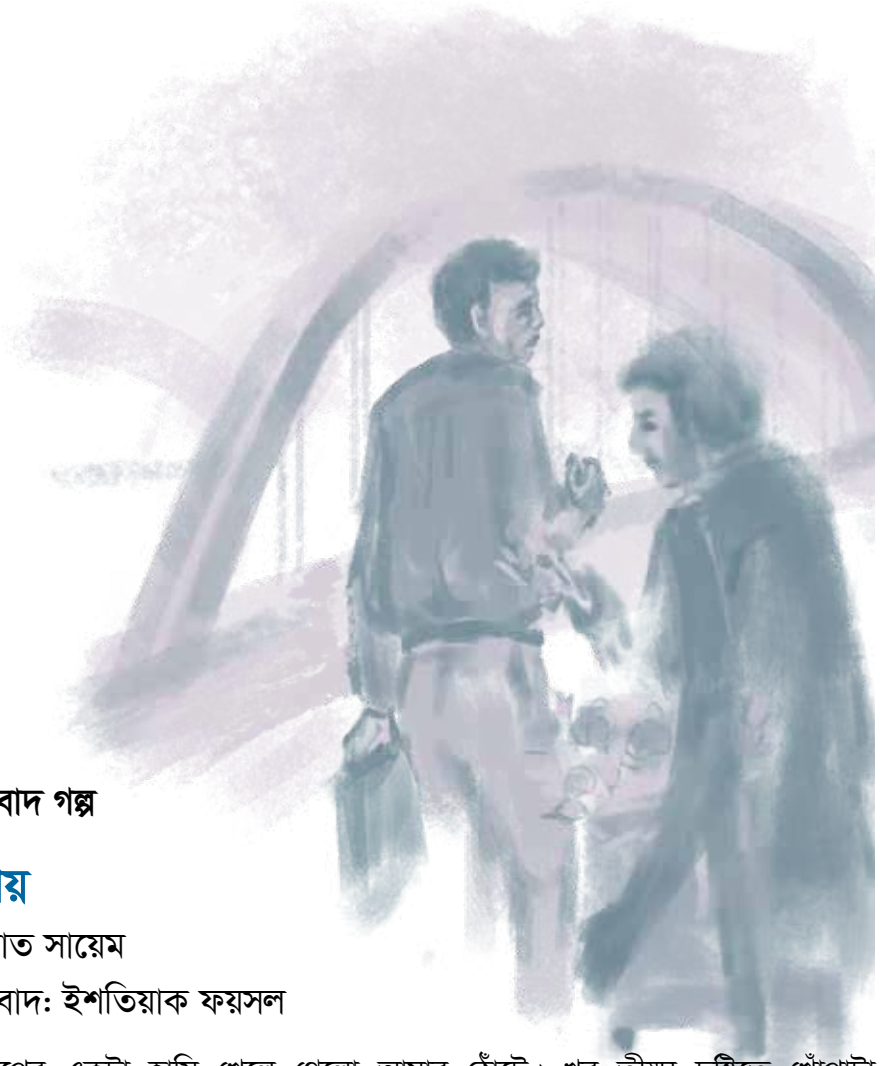

অনুবাদ গল্প

প্রণয়

সাদাত সায়েম

অনুবাদ: ইশতিয়াক ফয়সল

বিদ্রুপের একটা হাসি খেলে গেলো আমার ঠোঁটে। খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে খোঁপাটা দেখছিলাম। নানান রকম ছোট ছোট সাদা ফুল দিয়ে সাজানো ওটা। কিছুক্ষণ ধরে চিনতে চেষ্টা করলাম কি ফুল ওগুলো। মেয়েটা বসে আছে মিরপুরগামী বাসটার তিন নাম্বার সারিতে জানালার পাশে, আর আমি তার পেছনের সারিতে।

মেয়েটার পাশে বসে থাকা ছেলেটা ক্রমাগত ওর কানের কাছে ফিসফিস করে কিসব বলে চলেছে। আমি ঘাড় উঁচিয়ে মেয়েটার মুখ দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখের বদলে দেখতে পেলাম ওর দুর্দান্ত ঘাড় আর বাঁ কানটা। আমার মনে হলো ওর বাঁ কানটা যেন ছেলেটার কথাগুলো শুনছে না। ওটা যেন ফাগুন বাতাসের প্রায় অশ্রুত গুঞ্জন শুনে চলেছে। দিনটা ছিলো ভ্যালেন্টাইনস ডে।

রামপুরা ব্রিজের কাছে এসে বাস থেকে নেমে গেলাম। নামার সময় বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে ওই প্রেমিক জুটিটার দিকে তাকালাম– বিশেষ করে মেয়েটার দিকে। ওর চোখজোড়া হাসছে– চটপটে ছেলে বন্ধুটির বুদ্ধিদীপ্ত কোন কৌতুকে হবে হয়তো। দেখলাম মেয়েটার গালে টোল পড়লো।

আমি চল্লিশ ছুই ছুই একজন মানুষ। ডাক্তার বলে দিয়েছেন দৈনিক ন্যুনতম বিশ মিনিট

প্রণয়

সাদাত সায়েম

অনুবাদ: ইশতিয়াক ফয়সল

হাঁটা আমার বাধ্যতামূলক। আসন্ন টাইপ-২ ডায়াবেটিসের আগমন বিলম্বিত করতে ডাক্তারের এই নির্দেশ। তাছাড়া হাঁটা নাকি আমার অনিদ্রারও একটা চিকিৎসা হতে পারে। স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকেই রোগটাতে ভুগছি আমি।

যাহোক, হাতিরঝিলের একটা ওয়াকওয়ে দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম আমার অফিসের দিকে। কিছুদূর যাবার পর প্রথম যে লোকটার সাথে দেখা হলো সে একজন ফুলবিক্রেতা। ওয়াকওয়ের উপর একটা ভ্রাম্যমান দোকানে লাল গোলাপ বিক্রি করছিল সে।

– ফুল লাগবে স্যার? লাল গোলাপ?

সতর্কতার সাথে লোকটার দিকে তাকালাম, যদিও অনিদ্রার কারণে আমার চোখের পাতা স্বাভাবিকের চাইতে অনেক দ্রুতই পড়ছিলো। কিন্তু বাজপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো ওর চোখদুটো আমার নজর এড়ালো না। ছেলেটার বয়েস আমার থেকে বেশ কমই হবে। তার বাঁ কাঁধে পাটের তৈরী একটা ব্যাগ ঝুলছে।

টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা ফুলগুলোর দিকে তাকালাম। ছেলেটা ফুলগুলো এমনভাবে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছে যেন কোন দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করছে।

– একদম টাটকা ফুল স্যার। সাভার থেকে আনা হয়েছে। দ্যাখেন এখনো কেমন শিশির মুড়ি দিয়ে ঘুমায় আছে। আপনি কি স্যার নেবেন কয়েকটা?

– নাহ্। লাল গোলাপ টোলাপ দেয়ার মতোন কেউ নেই আমার।

আমার চাঁছাছোলা এই উত্তরে ছেলেটা কেমন থতমত খেয়ে গেলো। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে সে তার পরবর্তি কথাগুলো গুছিয়ে নিতে থাকলো।

ওখান থেকে ঝিলের দিকে তাকালাম। দেখলাম সকালের ঝিরিঝিরি বাতাস ঝিলের জলে বিলি কেটে যাচ্ছে।

– ফুল কত করে? টেবিলে সাজানো গোলাপগুলোর দিকে ইংগিত করে বলে উঠলো এক যুবক।

– আমি সেই ভোর থেকে আপনার অপেক্ষায় আছি, স্যার। অন্যরকম এক খোশামুদে স্বরে বলে উঠলো ফুলবিক্রেতা।

আমার কাছে মনে হলো একদম সঠিক খদ্দেরের দেখা পেয়ে গেছে ছেলেটা আর তাতে বেশ সন্তুষ্টই মনে হলো তাকে। আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

'স্যার', পেছন থেকে আমাকে ডাকলো ছেলেটা। 'যদি আমাকে আরো খানিকটা সময় দিতে পারেন, তাহলে আপনার সাথে অন্য আরেকটা ব্যাপারে একটু কথা বলতাম।'

এই ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীরা কত ফিকিরই না করে তাদের জিনিসগুলো মানুষকে গছিয়ে দিতে! তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলাম ওর অনুরোধে সাড়া না দিতে। কিন্তু ঠিক কি কারণে জানিনা, আমি ওকে না বলতে পারলাম না।

ফিরে গিয়ে ওর টেবিলের পাশে কংক্রিটের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম।

'আমার কথায় যদি কিছু মনে না করেন, স্যার, ফুলের পাশাপাশি আমি প্রেমসঞ্জীবনী বিক্রি করি,' সরাসরি আমার চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলে উঠলো সে।

'প্রেমসঞ্জীবনী!' অবাক হয়ে নিজের অজান্তেই বিড়বিড়িয়ে বলে উঠলাম শব্দটা।

'জী স্যার, আমি মূলত ওটাই বিক্রি করি। আমার কাছে বিভিন্ন ধরণের প্রেমসঞ্জীবনী পাবেন। সেখান থেকে আপনার পছন্দমত একটা বেছে নিতে পারবেন,' এই বলে ছেলেটা তার কাঁধে ঝোলানো পাটের ব্যাগটার দিকে ইংগিত করে বলল, 'এক শিশিই যথেষ্ট, স্যার।'

'প্রেমসঞ্জীবনী? বিভিন্ন ধরনের? বলেন কি!'

'কোন কিছুর ধরন একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্যার,' বেশ বুদ্ধিদীপ্ত অথচ সরল একটা হাসি দিয়ে ছেলেটা ব্যাখ্যা করতে থাকে, 'ভালোবাসার সব রূপ আসলে একই রকম না, স্যার। মনে করেন আপনি গুইনিভিয়ের-লান্স্যলট ধরনটা পছন্দ করলেন। এতে খুব দ্রুত সফলতা আপনি পাবেন ঠিকই, কিন্তু তাতে সাংঘাতিক ঝুঁকিও থাকবে। আবার শিরি-ফরহাদ ধরনটা যদি পছন্দ করেন; তখন কিন্তু নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। হয়তো আপনার প্রেমযাত্রা হবে ভীষণ দীর্ঘ। জী স্যার, ভীষণ রকমের দীর্ঘ এক যাত্রা হতে পারে। পাহাড়ের বুক কেটে কেটে খোঁড়া সেই চল্লিশ মাইল খালের সমান। শিরিকে বিয়ে করবার জন্য যে খাল ফরহাদকে কাটতে হয়েছিল একা একাই।'

শিরি-ফরহাদের (শিরিন-ফরহাদ) বিষয়ে আমি শুনেছি। কিন্তু এই গুইনিভিয়ের-লান্স্যলট যে কারা সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাই নেই।

'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, স্যার, আমার এই সঞ্জীবনীটি চিরতরে মুছে দেবে আপনার চোখে থাকা নারীর প্রতি একই সাথে লালসা ও ঘৃণা,' বলে চলল ছেলেটা, 'এই সঞ্জীবনীটি আপনার হৃদয়ে আগুনের একটি শিখা জ্বালিয়ে দেবে। আপনার হৃদয়কে পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনায় পরিণত না করা পর্যন্ত সে নিভবে না। একজন নারীর প্রেমে পড়বার মধ্য দিয়েই অবশ্য এসবের শুরু হবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই প্রেমের এক পর্যায়ে আপনি মানবাত্মার আনন্দ ও কান্না শুনতে শুরু করবেন। প্রাণিজগতের আনন্দ ও বেদনাও অনুভব করতে পারবেন। শুনতে পাবেন উদ্ভিদের হাসি-কান্না। তখনই, হ্যাঁ স্যার, একমাত্র তখনই প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য আপনার সামনে মেলে ধরবে। নেবেন এক শিশি সঞ্জীবনী, স্যার? যাদের আসলেই এটা প্রয়োজন, আমি কিন্তু

তাদের কাছে দাম কমায়ে রাখি!'

কংক্রিটের বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালাম। একবার ফুলবোঝাই টেবিলটা আর একবার ছেলেটার কাঁধে ঝোলানো বিভিন্ন ধরনের প্রেমসঞ্জীবনী ভর্তি ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আমার গন্তব্যের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। যেতে যেতে মনে হলো আমার পিঠে বিঁধে থাকা বাজপাখির ঠোঁটের মতো চোখদুটোর দৃষ্টির ধার যেন ক্ষয়ে গেছে ততক্ষণে।

সময়ের সাথে সাথে আমাদের স্মৃতির ধারও ভোঁতা হয়ে যায়, তাই না? ঊনিশ বছর আগে এমনই এক বসন্তে গভীর নীল একটি সাগর দেখেছিলাম আমি মুনের চোখে। আমার গলা জড়িয়ে চোখে চোখ রেখেছিলো ও।

ডান হাতের তালুটা আমার কপালে রেখে বলেছিলো, 'একি! জ্বরে তো পুড়ে যাচ্ছো তুমি!'

বুকের ভেতরে অস্থির হৃদপিণ্ডটা মুখে কিছুই বলতে দিলোনা আমাকে। আমি ওর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করলাম। পুরো দুনিয়াটা যেন একটা বিন্দুতে এসে স্থির হয়ে গিয়েছিল। বাতাসে ছিল কি এক রহস্য!

সেসময় মুনের চিবুক বেয়ে ক'ফোঁটা জল ঠিক কি কারণে যে গড়িয়ে পড়েছিল তা আমি আজও জানতে পারিনি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো মুন। ওর দুগালে টোল পড়লো। দুচোখ ভরা জল নিয়ে আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো ও।

সেদিন যে ঠিক কি ঘটেছিলো তা আমি ঠিকঠাক মনে করতে পারবো না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে পরের কয়েকদিন আমার সমস্ত চিন্তা ও কাজকর্ম আচ্ছন্ন করে রাখলো মুন। আমার সমস্ত শরীরে ঘাম দিতো আর গন্তব্যহীন বাউণ্ডুলের মতো সারাদিন চষে বেড়াতাম শহরের পথঘাট।

তারপর একদিন গেলাম ওর কাছে।

– মুন শোন, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই।

– দয়া করে তোমার ঐ কিছুটা বলে ফেল, রায়হান!

ওর ঐ সাবলীল ভঙ্গি আর উচ্ছ্বল চেহারা আমার চিন্তাগুলোকে কেমন এলোমেলো করে দিয়েছিলো তখন।

– আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

কথাটা আমি বললাম ঠিকই, কিন্তু 'চাই' শব্দটার উপর কেমন অস্বাভাবিক একটা জোর পড়লো।

প্রণয়
সাদাত সায়েম
অনুবাদ: ইশতিয়াক ফয়সল

– কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না।

ও বেশ চাঁছাছোলাভাবেই জবাবটা দিলো আর কোন কিছুই না বলে।

এর ঠিক সাত মাস পর স্নাতক করতে মুন ইতালী চলে যায় ওর ভাইয়ের কাছে। তিনি ওখানকার স্থায়ী নাগরিক, থিতু হয়েছেন। এরপর বেশ লম্বা একটা সময় আমার আর মুনের কোন যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু কিছুদিন আগে ফেসবুকে ও আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়।

সেদিন কারওয়ান বাজারে আমার অফিসে পৌঁছার পর কোন কাজে মন দিতে পারছিলাম না। দুপুরের পর ঠিক করলাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে আমাদের পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন হবার পর মুনের পাঠানো মেসেজগুলো পড়বো।

আমি পড়তে শুরু করলাম।

'আমার উপর তোমার ক্ষোভ রয়ে গেছে আমি জানি। আমার আগের তিনটা মেসেজের উত্তর তুমি দাওনি। রায়হান, আমি দাঁড়িয়ে আছি চারদিকে দ্বীপ দিয়ে ঘেরা ভ্যানেশিয়ান লেগুনের সৈকতে। মনে হচ্ছে আমিও যেন এই উপসাগরটার মতো। আমার অতীত চারপাশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে আমাকে।'

'আমরা দূর সম্পর্কের আত্মীয়। একসাথে বড় হয়েছি ঢাকায়। তুমি তো জানোই আমি এমন একজন মেয়ে যে কোন কারণেই নিজের স্বত্ত্বাকে বিকোতে পারবে না। সেই বসন্তে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে। এটা কোন বিষয় না, কিন্তু সমস্যার শুরু হলো যখন আমি তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। তোমাকে আমি ভালোবাসতাম। তোমাকে জানতাম মানবিক ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ চমৎকার এক তরুণ হিসাবে। কিন্তু আমি বুঝতে ভুল করেছিলাম। প্রত্যাখ্যাত হয়ে তোমার ভেতরের মানুষটাকে দেখালে তুমি। তোমার সিদ্ধান্তকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইলে আমার উপরে।'

'আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতাম, তা করতাম শুধুই ভালোবাসার জন্য। কিন্তু তোমার জন্য আমার সব ভালোবাসা উবে গেলো যখন বিয়ে করার জন্য তুমি আমাকে চাপ দিতে থাকলে।'

'আমাকে যখন চড় মারলে, আমার গলা চেপে ধরলে, তোমার চোখে দেখেছিলাম শুধু হিংস্রতা। ওই বসন্তের আগে এত হিংস্রতা তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে? কিন্তু আমার মন একেবারেই ভেঙ্গে গেলো যখন তুমি আমাকে বেশ্যা বলে গাল দিলে। সেই ভেঙে যাওয়া মনটা আর কখনো জোড়া লাগেনি।'

'এতগুলো বছর পর অতীত নিয়ে তোমাকে লেখাটা ঠিক উচিত হচ্ছে না আমার। মনে হয় অতীতের বোঝাটা হালকা করতেই কথাগুলো উগরে দিলাম। ঐ স্মৃতিগুলো বয়ে

চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।'

একটা সিএনজিতে চড়ে বসলাম আমি। উদ্দেশ্য সেই প্রেমসঞ্জীবনী বিক্রেতা। কিন্তু তার সাথে যে জায়গাটাতে সকালে কথা হয়েছিল সেখানটায় পৌঁছে ছেলেটাকে দেখতে পেলাম না। ঐ জায়গায় আরেকটা ছেলে ফুল বিক্রি করছিলো।

'সকালে যে ছেলেটা ফুল বিক্রি করছিলো এখানে তাকে কি আপনি দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলাম নতুন ফুল বিক্রেতাকে। 'হালকা পাতলা গড়নের কম বয়েসি একটা ছেলে। চোখ তার খুব বাঁকা আর সাথে চটের একটা ব্যাগ ছিল।'

'বুঝতে পারছি না, স্যার, আপনি কার কথা বলতেছেন। জ্বী, সকালে অবশ্য আমার বড় ভাই ফুল বিক্রি করছিলো। সে খুব সকাল সকাল উঠে তাই দায়িত্বটা দিয়েছিলাম। কিন্তু ওর চোখ তো আমাদের আর সবার মতোই। বরং স্বীকার করতেই হয় ও একটু পাগল কিসিমের। কি করবেন বলেন, আপনার প্রেমিকা যদি আত্মহত্যা করে আপনি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায়, তখন আপনার অবস্থা এর চেয়ে আর কী ভালো হতে পারে?'

আমার ভাইটা কিন্তু, স্যার, ভালো মানুষ। ও মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায় নাই কবি হবে বলে এই একমাত্র কারণে। ও চাইতো মেয়েটা ওর কবিতার অনুপ্রেরণাদানকারী হয়ে থাকবে কেবল। মেয়েটার পরিবার জোর করে ওকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এক ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু মেয়েটা সেই ঘর করেনি। পালিয়ে আমার ভাইয়ের কাছে চলে আসে। কিন্তু ও মেয়েটাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। মেয়েটার আত্মহত্যার পর আমার ভাইটা কবিতা লেখা ছেড়ে দেয়। যদিও সে এখনও কাঁধের ঝোলায় কবিতা লেখার খাতা আর কলম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর আবোল তাবোল কিসব বলে যার কোন মাথামুণ্ডু নাই।'

'ও, মানে আমার ভাইটা আসলে মারা গেছে, স্যার,' বলে চললো ছেলেটা, 'আপনি মানেন আর না মানেন, যে মানুষ শুধু তার অতীতেই বাঁচে, আমাদের মত ছোট বা বড় যে কোন ব্যবসাদারের কাছে সে মৃত। পাগল কিছিমের মানুষ এখনো জন্মায় দুনিয়াতে। ঐ মেয়েটাও পাগল ছিলো। আপনিই বলেন, স্যার, এই যুগে এক হবু কবির জন্য কেউ আত্মহত্যা করে?'

আমি ঝিলের দিকে তাকালাম। একটা মরা ঘুঘু ভাসছে জলে। সন্ধ্যার বাতাস তার দেহটাকে মৃদু দোলা দিচ্ছে।

আমার মানসপটে ভেসে উঠলো সেই প্রেমসঞ্জীবনী বিক্রেতার মুখ। মনে পড়লো সে বলেছিল–

প্রণয়

সাদাত সায়েম
অনুবাদ: ইশতিয়াক ফয়সল

‘প্রেম কোন যুদ্ধ নয়, স্যার। মানে যুদ্ধ আর প্রেমকে আপনি একই বাক্সে রাখতে পারেন না। এমনকি যুদ্ধেও আপনি যা খুশি তা করতে পারেন না, স্যার।’

আমার চোখে জল এলো। কিন্তু চোখের জল একটা ভাঙা মন জোড়া দিতে অক্ষম।

তবু এই বসন্তে, শিল্পায়ন আরোপিত সমস্ত প্রতিকূলতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে, প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে বরণ করে নিতে চলেছে নতুন এক প্রেমিকযুগলকে। শহরের সমস্ত রাধাচুড়া আর কৃষ্ণচুড়া তাদের শীতনিদ্রা ভেঙে জেগে উঠছে ফুল ফোটাবে বলে।

প্রণয় (Love) গল্পটি সাদাত সায়েমের প্রকাশিতব্য ইংরেজি গল্পগ্রন্থ ‘*Disgrace and Others*’ অন্তর্ভুক্ত।

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিত ই-বই:

শাহবাগ মন উদ্বাগ : ইচক দুয়েন্দে

দূরত্বের সুফিয়ানা : বদরুজ্জামান আলমগীর

এগারো সিন্দুর : রফিক জিবরান

তিন ডানাওয়ালা পাখি : রফিক জিবরান

পিপাসার জিনকোড : সাদাত সায়েম

মাটির উনুন ও যুবকের ওম : সৈয়দা হাবিবা

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিতব্য ই-বই:

বইগুলো পেতে ভিজিট করুন:

www.bhatphul.com